তিনি

ফারহীন জান্নাত মুনাদী

সমর্পণ

একটু একটু করে বেড়ে ওঠা তিতিনের তাওফীকা হয়ে উঠতে কত রঙের আলো, কত গাঢ় আঁধার পেরোতে হয় তা কেবল তিতিনরাই জানে। তিতিনরা জানে, লোক-চোখে অস্বচ্ছ সস্তা জীবন-মানে অভ্যস্ত মানুষগুলোর হৃদয়ের প্রসারতা; যারা হতাশায় মুহ্যমান একজন মানুষকে সুখ দিতে না পারলেও দিতে পারে বেঁচে থাকার প্রেরণা, দিতে পারে তাঁর স্মরণে স্বস্তি আর শান্তির খোঁজ।

ভূমিকা

আমরা যে সময়ের অভিযাত্রী, সময়টা বড়ো নাজুক। আমাদের সামনে যেন আত্মপরিচয়হীন এক প্রজন্ম, যেন 'ভবিষ্যৎহীন' এক ভবিষ্যৎ। প্রজন্ম যখন আত্মপরিচয় ভুলে যায়, তখন নেমে আসে জীবনের প্রতি হতাশা, হীনম্মন্যতা। শুরু হয় ভুলের পথে যাত্রা আর ভীড় বাড়ে পথহারা পথিকের মিছিলে। তাই বলে কি আমরা এ প্রজন্মকে সে পথেই ছেড়ে দেব? অবুঝ প্রাণগুলোকে কান্ডারিহীন নৌকোয় ভাসিয়ে দেব?

না, যারা নিরাশার কথা বলে আমরা তাদের দলে নই। যারা সম্ভাবনার কথা বলে আমরা তাদের সারথি। আমরা চাই বদলাতে, পথহারা জাতিকে আলোর নতুন দিগন্ত দেখাতে। আমরা চাই তাদের কাঁধে স্নেহের হাত রাখতে এবং ভালোবাসামাখা মিনতি জানাতে।

তারই এক প্রচেষ্টা এই 'তিতিন'। এ এমনই একটি চরিত্র—অন্ধকার সমাজের কালো ছায়ায় যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি, বরং সে আঁধারকে আলোতে রূপান্তরের সংগ্রামে নেমেছে। বড়ো আকুলতা নিয়ে বলছে—বন্ধু, ফিরে এসো! আলো এ পথে! বিজয় তোমার অপেক্ষায়!

ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ বাড়িটার সাথে সামনে দাঁড়ানো পুরোনো প্রাডো গাড়িটার খুব মিল। দুয়ের মাঝে দাঁড়ানো শুভ্রবসনা এক নারী যেন অশরীরী কিছু। মধ্য-দুপুরের চাঁদি জ্বালানো রোদেও এখানে আলো-আঁধারির খেলা, শান্ত বিকালের ছায়া—মধুমঞ্জুরীর উঁচু গাছগুলো যেন তৈরি করেছে ভিন্ন এক জগৎ। অপার্থিব এক অনুভূতিতে শিউরে উঠল সে নারীর তনু-মন। কত..! কতকাল পর আবার এই পথে পা রাখা! জীবনের কতগুলো মোড় পেরিয়ে আবারও ইতিহাস খুঁড়তে আসা!

মৃদু-কম্পিত পায়ে হেঁটে চলা মানুষটির চোখে তখন অন্য কিছুর ছায়া, লুটোপুটি খাচ্ছে ভুলতে চাওয়া সময়েরা। তিনি তখন তিতিন। আট বছর বয়সী ছোট্ট তিতিন, ব্লু-বার্ড স্কুলের অমনোযোগী ছাত্রী। ওখানে সব বড়লোকদের আহ্লাদী সন্তানদের চলাফেরা। ছোট্ট তিতিনও তখন এক বড়লোক ঘরের সন্তান। আহ্লাদী, আদুরে সন্তান।

পঞ্চম পিরিয়ড। নীলা ম্যাডামের ক্লাস। গাম্ভীর্য আর রাগ দুইয়ের মিশেলে এক ভীতিকর ব্যক্তিত্ব তিনি। একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ যেন কোনো ধারালো অস্ত্রের ফলা। চশমার কাঁচ ভেদ করে ওই তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর দিকে তাকাতে পারে, সে সাহস বোধকরি ওদের ক্লাসের কারওই নেই। কড়া এবং রাগী হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দুর্নাম কামিয়েছেন তিনি। অর্থবিত্তের ছড়াছড়িতে এ স্কুলে তার অবস্থানের মেয়াদ যে স্বল্পই হবে সে বোঝাই যায়। এখানে পড়াশোনার তুলনায় টাকার কাগজের খসখসানির জোরটাই বেশি।

তিতিন বিরক্তিকর মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে—কবে যে তিনি যাবেন! ঠিক তখনই ক্লাসরুমে সলীম শেখের মুখখানা উঁকি দিল। ওদের ড্রাইভার।

চমকে উঠল ও। এ সময়ে ড্রাইভারের এখানে কী!

সলীম শেখ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। ম্যাডাম বিরক্ত চোখে তাকালেন। ভাবটা এমন—ক্লাসে এসে বিরক্ত করার মতো তুমি কে বাপু! কিন্তু কিছু করার নেই। এ স্কুলে এমন অনিয়ম হবেই। দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়লেন তিনি।

সলীম শেখ ম্যাডামের দিকে এগিয়ে গেল, একটু ঝুঁকে নিচু গলায় কী যেন বলল। ম্যাডাম কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। 'কী করব বুঝে উঠতে পারছি না' ধরনের একটা ভাব নিয়ে আঙুলের ইশারায় তিতিনকে ডাকলেন। বিস্মিত তিতিন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

কাছে আসতে ম্যাডাম আচমকাই জড়িয়ে ধরলেন! ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তিতিন, তোমার....' আর কিছু বলতে পারলেন না। গলা বুজে এল।

ম্যাডামের গা থেকে একধরনের গন্ধ আসছে। ঠিক মায়ের মতোন। ছোট্ট তিতিন তখন জানত না, সব মেয়েদের গায়েই মায়ের গন্ধ লেগে থাকে। ভালোবাসামাখা হৃদয়েই কেবল সে গন্ধ ছুঁয়ে যায়। ঘাড় তুলে তিতিন ম্যাডামের চোখের দিকে তাকাল, প্রথমবারের মতো। ম্যাডাম কাঁদছেন! তার চোখে টলটল করছে অশ্রু। কী অদ্ভুত!

চোখের ভাষা পড়তে পারলে সে বুঝত, এ অশ্রুর নাম মায়া। ম্যাডামের চোখের অশ্রুতে এতদিন তার ওপর তেতে থাকা দ্বিতীয় শ্রেণির স্টুডেন্টদের মনটাও বিষণ্ন হয়ে গেল। মনের ভাষা পড়তে পারলে তারা বুঝত, এ বিষণ্নতার নাম মায়া। একরাশ মায়া মেখে তিতিন দুপুর ছুঁই ছুঁই করা সূর্যের আলোতে বেরিয়ে এল।

সে তখনো জানে না কেন তাকে এখনই বাসায় যেতে হচ্ছে! সলীম শেখের মুখ এত গম্ভীরই-বা কেন! কেবল কানে বাজছে কোলে করে গাড়িতে তুলে দেয়ার সময় নীলা ম্যাডামের কথা, 'দ্রুত স্কুলে ফিরে এসো!' জীবনের এতগুলো বসন্ত পেরিয়ে এসেও যেন তাওফীকা সেই ছোট্ট তিতিন রয়ে গেছেন! বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'আমি স্কুলেই ফিরছি ম্যাম! খুব শিগ্রি!'

২

পুরোনো কিন্তু প্রচণ্ড মজবুত দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখলেন তাওফীকা। অব্যক্ত এক অনুভূতি বয়ে গেল তার পুরো দেহজুড়ে, সহকর্মী আইদার দিকে একবার চোরা চোখে তাকালেন। পাছে লুকিয়ে রাখা অশ্রুগুলো ফাঁস হয়ে যায় কি না! ইচ্ছে করল প্রতিটা দেয়াল হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে। কত নীরব ইতিহাসের সাক্ষী এ বাড়িটির প্রতিটি দেয়াল। ইট–কাঠ–সুরকি। তার মায়ের অজস্র অশ্রুর নীরব সহমর্মী।

প্রতিরাতে বাবা যখন নিত্যনতুন 'আন্টিদের' নিয়ে ঘরে ফিরতেন, তখন মায়ের কেমন লাগত, তার কিছুটা এখন তাওফীকা অনুভব করতে পারেন। ছোট্ট তিতিন তখন অবাক হয়ে নিস্পন্দন মায়ের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত। কেনই-বা মা তাকে বুকে চেপে ধরে অর্ধচেতনের মতো পড়ে থাকেন, সেটুকুও বোঝেনি তখনকার তিতিন। কেবল বুঝত, মায়ের কষ্ট হচ্ছে। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। মাকে যখন বাবা গালে চড় মেরে দেয়ালে ছুড়ে ফেলতেন, তখনো তিতিন বুঝত মায়ের কষ্ট হচ্ছে—খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মা তার সামনে কাঁদেননি, কখনো কাঁদেননি।

একদিন ছাড়া। চলে যাবার আগের দিন। সে দিনটি কখনো মুছে যাওয়ার নয় আজকের তাওফীকার জীবন থেকে, অতীতের ছোট্ট তিতিনের জীবন থেকে।

সেদিনও সকালে সূর্য উঠেছিল। সেদিনও তিতিন স্কুলে গিয়েছিল। দুপুরে ফিরে দেখে মা ওর জন্যে ফিরনি রেঁধে অপেক্ষা করছেন। সাদা শাড়ি পরা, লাস্যময়ী মায়ের এমন রূপ খুব কমই দেখেছে তিতিন। চড়ের আঘাতে গলায় ও গালে নীল তোয়ালে জড়ানো মাকে দেখেই সে অভ্যস্ত।

বাসায় ফিরতেই ওকে কোলে নিলেন মা। নিজ হাতে গোসল করাতে করাতে গজগজ করতে লাগলেন, 'গায়ে এমন ময়লা হয়েছে! মাজেদাটা যে কী! আসলে টাকার চাকর চাকরই হয়! বোন হয় না! নিজের গোসলটা এখনো নিজে করতে শিখিসনি! আমি না থাকলে কী করবি!'

মায়ের বকুনি শুনে তিতিন মিটিমিটি হাসছিল। আম্মুর মন ভালো, মানে বাবা আজ বাসায় নেই। আজ ওরা ঘুরতে বের হবে। মায়ের আঙুল ধরে পথ থেকে

পথে হেঁটে বেড়ানোর লোভে ওর চোখ চকচক করতে লাগল। সত্যিই বিকেলে মা ওকে নিয়ে হাঁটতে বের হলেন, হাওয়াই মিঠাই কিনে খাওয়ালেন। কাছেই এক নদী। নদী ঘেঁষে হাঁটতে গিয়ে মৃদু বাতাস মা-মেয়েকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মা প্রচুর কথা বলছিলেন সেদিন, অর্থহীন কথা। এই যেমন—ছোটবেলায় তার নানু মাকে কী বলতেন, একবার নদীতে সাঁতরাতে গিয়ে কী হয়েছিল...।

এসব গল্প শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু তিতিন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। এমন নির্ভার ও হাস্যমুখী মাকে ও খুব কমই দেখেছে! সেদিন মা ওকে পড়তেও বসাননি। মজনু মিয়া আর তিতিন মিলে পুরো বাড়ি দাবড়ে বেরিয়েছে। লুকোচুরি খেলেছে। হাঁড়িপাতিল খেলেছে। রাত গড়াতেই মা ঘুমানোর প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। তিতিনের একটুও ঘুম ছিল না। ও মায়ের সাথে গল্প জুড়ে দিল। মাকে সেদিন ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধুটির মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু খুব যতনে তাদের গল্প থেকে একটা চরিত্র বাদ রইল—বাবা, যে চরিত্র এলে গল্পেরা শব্দ খুঁজে পায় না।

–মা! আমার দাদুবাড়ি নেই?

–এটাই তো তোর দাদুবাড়ি মা!

–তবে দাদা-দাদু কোথায়? তুমি কখনো তাদের গল্প করো না কেন?

–তোর দাদা-দাদু এক বৃদ্ধাশ্রমে আছেন। নিজেদের বাড়িতে ঠাঁই হয়নি তাদের। চিলেকোঠার ট্রাংকটাতে তাদের কিছু জিনিস আমি খুব লুকিয়ে চুরিয়ে রেখে দিয়েছি। একদিন দেখে নিস!

–তুমি দেখিয়ো?

মা চুপ করে গেলেন। ছোট্ট তিতিন অবাক চোখে দেখে মা কাঁদছেন! জীবনে প্রথম! জানত না, এ-ই শেষ!

–আম্মু, কাঁদছ!

মায়ের নিঃশব্দ কান্না যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল। ওকে বুকে জড়িয়ে বেসামাল কিশোরীর মতো কাঁদলেন মা। অবুঝ তিতিনও কোনো কারণ ছাড়াই কেঁদে ফেলল। সে রাতে আর কথা হয়নি। পরদিন মাকে আর দেখতে পায়নি ও। দেখতে দেয়া হয়নি!

–আইদা!

–ইয়েস ম্যাম!

–তোমার বাবা–মা আছেন?

–মা আছেন, বাবা নেই।

–মা কী করেন?

–মা বয়স্ক হয়ে গেছেন, বাড়িতে থাকেন আমার সাথে।

–বাড়িতে আর কে কে থাকে?

–আমি, মা আর সিয়াম।

চুপ করে গেলেন তাওফীকা। প্রশ্নগুলো বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে। ওর কেইস স্টাডি করা উচিত ছিল অনেক আগেই। আজকাল কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। যে উৎসাহ নিয়ে 'আঁচল' শুরু করেছিলেন, তাতে অনেক ভাটা পড়ে গেছে। আগে সবগুলো কেইস স্টাডি, ফিল্ড ইনভেস্টিগেট, কাউন্সেলিং ও ফলোআপ সব নিজেই করতেন। এখন আর হয়ে ওঠে না। সমাজের তিক্ততা যেন হৃদয়কে জর্জরিত করে ফেলেছে। কিন্তু তাকে ঝিমিয়ে পড়লে তো চলবে না! সে জন্যেই অনেকদিন পর একটা কেইস সরেজমিনে দেখতে এসেছেন।

–ঝুমুর তো এই এলাকারই মেয়ে, তাই না?

–ইয়েস ম্যাম। পাশের গ্রামেই তার বাড়ি। তাকে বলা হয়েছিল, আমরা সেখানে আরও তিন দিন পর যাবো।

ঝুমুরের কেইসটা এসেছে গত সপ্তাহে। সে 'আঁচলে'র একজন সদস্য হতে চায়। এতে করে তার বাসস্থান হবে, কর্মসংস্থান হবে। আঁচলের সদস্য কেবল তারাই হতে পারে, যারা কোনো–না–কোনোভাবে সমাজে নিগৃহীত, নিপীড়িত। শুধু দায়িত্বশীলরাই তাদের কেইস ডিটেইলস জানবেন এবং তারাই ফিল্ড ভিজিট করে সত্যতা যাচাই করবেন। অন্য সদস্যদের কাছে তা গোপন রাখা হবে। আঁচল টিম এ পর্যন্ত তাদের গোপনীয়তার নীতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। আঁচল অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, মেম্বার বাড়ানো প্রয়োজন। অনেক যাচাই–বাছাইয়ের পর

ম্যানিজিং বডিতে নাইলা কয়েকজন মেম্বার যুক্ত করেছে। আইদা তাদেরই একজন। আইদা আঁচলের দুই বছরের পুরোনো সদস্য। এ দায়িত্বশীল টিমের বর্তমান সদস্য-সংখ্যা তেরো জন। আর আঁচলের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৮৯ জন। এদের মধ্যে কেউ আছে অন্যায়ভাবে তালাকপ্রাপ্তা, দৈহিক খুঁতের কারণে সমাজে নিগৃহীতা, এতিম হওয়ার কারণে নিপীড়িতা। তাদের প্রত্যেকের কেইস সরেজমিনে তদন্ত করা। আঁচল এদের সবাইকে একটা করে সেলাই মেশিন দিয়েছে, কাজ শেখার জন্যে প্রশিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। পাশাপাশি প্রতিজনের জন্যেই আবাসন ব্যবস্থা ও খাদ্যের জোগান রয়েছে। এখান থেকে আরও সাপ্লাই হয় নকশিকাঁথা, হোম মেইড খাবার, কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি ইত্যাদি। এর ফিফটি পার্সেন্ট জমা হয় আঁচলের অ্যাকাউন্টে। তা ব্যয় হয় সদস্যদের খাদ্য, প্রশিক্ষণ, দায়িত্বশীলদের সেলারি, চিকিৎসা এবং নতুন সদস্যদের পেছনে। বাকি ফিফটি পার্সেন্ট সব সদস্যের মাঝে সমহারে ভাগ করে দেয়া হয়। যার প্রায় সবটাই তাদের সঞ্চয়। এতে করে তাদের মাঝে কোনো হীনম্মন্যতা কাজ করে না।

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রমাণ করার যুদ্ধে রত এ নারীরা ইতিমধ্যেই দৃষ্টি কেড়েছে বৈশ্বিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর। অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়াতে চেয়েছে। কিন্তু তাওফীকা সসম্মানে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যের দয়া-দক্ষিণায় নয়, নারীরা বাঁচবে সসম্মানে। অন্যায় পুষে চলা সমাজকে ঘৃণাভরে পায়ে দলে!

–ঝুমুরের বাড়িতে আজ যাব না কাল?

হাতঘড়ি দেখল আইদা।

–ম্যাম, এখনো যথেষ্ট সময় আছে হাতে। রাতে ফিরে এখানে থাকা যাবে। এখন যাওয়া যায়।

–ওকে! লাঞ্চ সেরে রওনা হব আমরা।

ওপরতলায় এখন যাবেন না বলে ঠিক করলেন তাওফীকা। নীচতলাতেই এক রুমে লাঞ্চ সেরে নেয়া যাক। আইদাকে নিয়ে এগোলেন ধীরপায়ে। সবার প্রথমেই পড়ল মজনু মিয়ার রুমটা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মজনু মিয়া বেঁচে আছে না মরে গেছে জানা নেই তাওফীকার। যেদিন মা চলে গেলেন, সেদিনই মজনু মিয়াকেও হারিয়েছিল তিতিন। দীর্ঘদিন কেয়ার টেকারের কাজ নেয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকা সলীম শেখ সেদিনের ভিড়ের সুযোগে বুড়ো মানুষটার ঘরে হিরোইনের প্যাকেট রেখে দিয়েছিল। পুলিস সব রুম চেক করার সময় মজনু মিয়ার ঘরে এই প্যাকেটটাও পেয়ে যায়।

বিস্মিত মানুষটিকে যখন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ছোট্ট তিতিন কেঁদেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। অথচ মায়ের বিদায়ও তাকে এতটা কাঁদাতে পারেনি। ভেবেছিল, এক ছায়া চলে গেলেও আরেকজন তো আছে। যখন দুই ছায়াই হারিয়ে যাচ্ছে, সেটা সইতে পারেনি তার কচি মন। কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো হাত ছিল না শত মানুষকে বুকে ধারণ করা 'মধুমঞ্জুরীর' মাঝে।

সে একাকীই ছিল। এক দিন, দুই দিন, টানা আট দিন। মা, মজনু মিয়া না থাকায় বাড়িটা তখন সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হয়ে গিয়েছিল। তিতিন রুম থেকে বের হলেই সামনে পড়ত ঝাঁকড়া চুল, উন্মাদ দৃষ্টির কিছু ভয়ংকর লোকের। কেউ কেউ কেমন করে তাকাত। ভয়ে সে ঘর থেকেই বের হতো না। কেউ তাকে স্কুলেও নিয়ে যেত না। পড়ার খোঁজও কেউ নিত না। তিতিন নামের একটা প্রাণী যে এ বাড়িতে বাস করে তা বোধকরি বাবা জাহাঙ্গীর আলম ভুলেই গিয়েছিলেন!

অষ্টম দিন। তিতিন মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের রুমের দিকে যাচ্ছিল, বেলকনিতে তাদের কয়েকজনকে দেখতে পেল। ভাব-ভঙ্গি কেমন যেন ঠেকল ওর কাছে।। এই ব্যালকনি পেরিয়ে ওর রুমে যেতে হবে। পা টিপে টিপে ও হাঁটতে লাগল, যেন লোকগুলো পায়ের আওয়াজ না পায়। ব্যালকনির দরজার সামনে এসে থামল। চোখ বুজে দেবে নাকি এক দৌড়? চোখ বুজে বড় এক শ্বাস নিল। শ্বাস ছাড়ার আগেই ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের স্রোত নেমে গেল।

কী শুনছে এসব? খুন! আগামী পরশু একজনকে খুন করবে ওরা! ও স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। শুনে ফেলল তাদের পুরো পরিকল্পনা।

–তিতু সোনা!

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক আসায় চমকে চেঁচিয়ে ওঠে ও। ঘুরে তাকিয়ে দেখে এক ষণ্ডা। শব্দ খুঁজে পায় না ও।

–কী শুনছ তুমি? কেমন ঠান্ডা স্বর তার। ভয়ে তিতিনের অন্তর এইটুকুন হয়ে যায়।

–যাও, এখুনি চলে যাও এখান থেকে। তুমি কিছু শোনোনি, কেমন?

তিতিন এক ছুট দেয়। ওর ঘরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে হাঁপাতে থাকে। ওর অন্তর কাঁপতে থাকে, কাঁপতেই থাকে।

ছোট্ট তিতিন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু এ ভয় তাকে এক ভয়ংকর কাজে দুঃসাহসী

করে তুলল।

পরদিনই সে বাড়ি থেকে পালাল। সাথে নিল মায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই রুমাল, ট্রাংক থেকে দাদা-দাদুর ছবি, তার কিছু কাপড়চোপড়, মায়ের কিছু গহনা ও আলমারিতে রাখা কিছু অর্থ। স্কুলব্যাগে সবকিছু চাপাচাপি করে ঢুকিয়ে একদম ভোরে সে বেরিয়ে পড়েছিল অজানার উদ্দেশ্যে। অজানা হলেও যেন ঠিক অজানা ছিল না। সে জানত কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু জানত না কেন যাচ্ছে! সে বোঝেনি অমোঘ নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের দিকে!

গনগনে সূর্য মাথায় নিয়ে আইদা ও তাওফীকা হেঁটে চলেছেন খেতের আইল ধরে। ইচ্ছে করেই পাকা রাস্তাটা এড়িয়ে গেছেন তাওফীকা, আইল ধরে হাঁটছেন অভ্যস্ত এক মানুষের মতো, যেন এ পথে তার নিত্য যাতায়াত! অথচ শেষবার পা ফেলেছিলেন প্রায় দেড় যুগ আগে, তিতিনের পায়ে ভর করে, বাড়ি থেকে পালানোর সময়! এক দুঃস্বপ্ন থেকে আরেক দুঃস্বপ্নের দিকে ছুটে চলার সময়! শাকিলের কাছে যাওয়ার সময়! যদিও দুঃস্বপ্ন ছিল, কিন্তু তার জীবনের উত্থানও এ শাকিলের হাত ধরে। আজকের তাওফীকা হাসানের অর্ধেকটাই শাকিলের গড়ে যাওয়া। কিছুদূর এসে আইল ছেড়ে মেঠো পথে উঠল তারা। সলীম শেখের বাড়ির পথ এটা।

আচ্ছা! সেই যে উধাও হলো শাকিলকে হত্যা করতে গিয়ে আর তো কোনো খবর নেই! সে কি বেঁচে আছে না মরে গেছে? শাকিলকে ও খুনের খবরটা আগেই দিয়ে দেয়ায় শাকিল কি সলীমকে হত্যা করে ফেলেছিল? নাকি ছোট্ট তিতিনের অনুরোধ রক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছিল? তাওফীকা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, তার জীবনের অনেক চরিত্রেরই শেষ খবর তার জানা নেই। ইচ্ছে করেই জানেননি নাকি জানার সুযোগ ছিল না, সে প্রশ্নের উত্তর এই এতকাল পেরিয়ে খোঁজার আগ্রহ তৈরি হলো না।

–আইদা, আর কতদূর?

আইদা বিস্মিত!

–ম্যাম, আমরা মোটে পনেরো মিনিট হেঁটেছি!

জিভ কাটলেন তাওফীকা। এক দীর্ঘশ্বাস লুকোলেন। এই পনেরো মিনিটেই যে তার জীবনের কতটা পথ তিনি হেঁটে ফেলেছেন, সে তিনি আইদাকে কী করে বোঝাবেন!

–চাচা, গইস মিয়ার বাড়ি কোনটা?

এই গাঁয়ে এমন আভিজাত্য নিয়ে হেঁটে চলা নারী খুব কমই আছে। বৃদ্ধ মানুষটি আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন,

–ওই বাড়িত ক্যান যাইবা?

–একটু কাজ ছিল, চাচা। ওর বউ ঝুমুরের বান্ধবী আমরা।

–বউ তো গইসের বাড়িতে না। বউরে ছাইড়া দিছে।

–তাই বুঝি! কবে! কেন!

–সেইটা তোমরা শুইনা কী করবা!

দীর্ঘশ্বাস পড়ে বৃদ্ধের, 'তোমরা বরং এই পথে যাও। ঝুমুরগো বাড়ি ওই দিক দিয়াই।'

–কিন্তু ঝুমুরের এমন হলো কেন, চাচা? আমরা তো ওর বান্ধবী, আমাদের একটু বলেন না!

–গইস একটা ডাকাইত মা, একটা ডাকাইত!

ক্ষোভ ঝরে পড়ল বুড়ো মানুষটির জোরালো কণ্ঠে,

–বাড়িত বড় বড় রাম দাও রাখে আর পেত্যেকদিন একটা কইরা মানুষ মারে। কই কই থিকা জানি অডার আসে, গইস হেই মানুষডিরে ধইরা আইনা আটকাইয়া রাখে। কয়দিন পর আর হেগোরে দেখা যায় না। আমাগোরে কয়, বাড়িত দিয়া আইছে। আসলে তো মাইরা ফালায়। মাজে মাজে কেওরা বিলে মাথা ভাসে। এই ব্যাডার লগে কে সংসার করতে পারব মা?

–আপনারা কি নিশ্চিত ও ডাকাত? পুলিসে জানাচ্ছেন না কেন?

–আর পুলিস! এই গত কাতি মাসেও এক পুলিস আগুনে পুইড়া মরছে। গইসের নামে নাকি বসের কাছে নালিশ করছিল।

তাওফীকা আর আইদা ভাবলেন, ঝুমুরকে আশ্রয় দেয়া এত সহজ হবে না বুঝি!

–আচ্ছা, চাচা! গইস তো মানুষ মারত। বউ ছাড়ল কেন?

এই ক্ষোভের মধ্যেও বৃদ্ধ হেসে ফেললেন,

–ঝুমুর গইসের তেরো নম্বর বউ। এর আগে আরও বারোটা বিয়া করছে আর ছাড়ছে। মাইয়া মানুষ ওর কাছে খেলনা। যারে মন চায় বিয়া করে, যারে মন চায় ছাড়ে। বাপ-মা বিয়া না দিলে তুইলা আনে। এরপর খারাপ কাম কইরা ভিডিও কইরা চাইর দিকে ছড়াইয়া দেয়। এর লিগা বাপ-মার বিয়া না দিয়া উপায় থাকে না।

তাওফীকা হাসান অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আছেন। এ গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের খুনে ডাকাত! ঝুমুর শুধু আবেদনপত্রে অভিযোগ লিখেছে—তার স্বামী তাকে অত্যাচার করত এবং দুশ্চরিত্রের ছিল। স্বামী তাকে ছেড়ে দেয়ায় বৃদ্ধা মাকে নিয়ে অসহায়ের মতো ভেসে চলেছে। কিন্তু এতকিছুর সামান্য ইঙ্গিতও দেয়নি সে। নাকি বুড়ো মানুষটার গল্পে কোনো হেরফের আছে? গ্রামের মানুষ তো রংচং চড়াতে খুব পছন্দ করে। হয়তো কখনো কোনো দিন এক মানুষের মাথা পাওয়া গেছে, সেটাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে কিসসা ফেঁদে বসেছে!

–আচ্ছা, চাচা! অনেক অনেক ধন্যবাদ। তা গইস মিয়ার বাড়ি তো এদিকেই, না?

–গইস মিয়ার বাড়ির দিকে যাইবা ক্যান আবার!

সন্দেহ ফুটে উঠল বৃদ্ধের চোখে,

–তোমরা ঝুমুরেরই বান্ধবী তো?

সুন্দর এক হাসি ফুটে উঠল তাওফীকার মুখে,

–ভয় পাচ্ছেন, চাচা? একটুও ভয় পাবেন না। আমরা ঝুমুরেরই বান্ধবী। ওর কাছে দুয়েকদিন পর যাব। এখন একটু গ্রামটা ঘুরে দেখব। গইস ডাকাতের নাম আগেই শুনেছি, তাই দেখার শখ জাগল!

অ! বড়লোকের আহ্লাদ আরকি! আগে কইবা না! আমি খামোকাই আবেগের পসরা নিয়া বসলাম! এমন একটা ভাব নিয়ে বৃদ্ধ চোখ কুঁচকালেন, বিরক্তিকর মুখে ফিরে যাওয়ার সময় ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

চিন্তার ভাঁজ পড়ল তাওফীকা হাসানের চোখেমুখে। চাচার কথা সত্যি হলে সামনে বড় বিপদ আছে। ঝুমুর নিশ্চয়ই গইস মিয়ার অনেক অপরাধের সাক্ষী। এমন কাউকে আশ্রয় দেয়া সহজ হবে না। যদিও তিনি ছোটখাটো গুন্ডা-মাস্তানের মুখোমুখি হয়েছেন এর আগে; তবে আঁচলে স্বাভাবিক নির্যাতিতার সংখ্যাই বেশি।

আইদা বলল, 'এই কেইসটা কি ছেড়ে দেবেন, ম্যাম? ঝুমুরকে আমরা কিছু আর্থিক সহযোগিতা করতে পারি। আশ্রয় দিতে গেলে....।' তাওফীকার মুখের ভঙ্গি দেখে থেমে গেল আইদা। স্বল্পভাষী এ মাঝবয়সী নারীকে শ্রদ্ধার পাশাপাশি প্রচণ্ড ভয়ও পায়।

–ভয় পেয়ে একটা মেয়েকে এভাবে ফেলে রাখব? গইস যে মেয়েটাকে আবার নির্যাতন করবে না সে নিশ্চয়তা কোথায় পেলে? সব ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার অঙ্গীকার নিয়েই জন্ম নিয়েছে আঁচল। এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন এই আমাকেই তুমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে বলছ!

আইদা চুপ হয়ে গেল। তাওফীকার দৃঢ়তা তাকেও ছুঁয়ে গেল। ওকে যখন আঁচলে আনা হয়, তখন এই টিম তার স্বামীর নানারকম হুমকিধামকি সহ্য করেই আশ্রয় দিয়েছিল ভেবে লজ্জাবোধ করল। প্রচণ্ড স্বার্থপর মনে হলো নিজেকে। ভাগ্যিস! ম্যাম ওর বিষয় তুলে লজ্জা দেননি!

–স্যরি ম্যাম। আসলে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা পিছুটান দিলে একটা মেয়ে দুনিয়াতে তার শেষ আশ্বাসটুকুও হারাবে। আমি বুঝতে পারিনি! এক্সট্রেইমলি স্যরি, ম্যাম!

'ধুর, পাগল' ধরনের এক হাসি দিলেন তাওফীকা। আইদার মন থেকে যেন একটা কাঁটা দূর হয়ে গেল। দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল। দুই জনের মনেই এক ভাবনা—কী করা যায়? প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা পাকা দালান দৃষ্টিতে এল। লোকজনের চলাফেরার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কিছু দোকানপাটও আছে। গ্রামে সাধারণত বাজার ছাড়া এত দোকান একসাথে দেখা যায় না। ধীরে ধীরে মেঠো পথ ছেড়ে ওরা মূল রাস্তায় উঠল। গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কেউ কেউ ওদের দিকে তাকাচ্ছে। তাওফীকা বুঝলেন, মেয়েদের এভাবে ঘুরে বেড়ানো এখানে স্বাভাবিক না। একটা টং দোকান খালি দেখে ঢুকলেন তিনি।

–চাচা, আমরা অনেকটা দূর থেকে এসেছি। এখানে বোধহয় মেয়েদের বসে চা খাওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু আমাদের একটু চা পেলে খুব উপকার হয়।

সিল্কের শার্ট পরা চল্লিশোর্ধ লোকটি মাথা নাড়লেন। হাতে থাকা টাকাগুলো গুছিয়ে বাক্সে রেখে উঁচু টং থেকে নেমে এলেন।

–চা খাইবেন তো? আমার লগে আসেন।

বলে হাঁটা ধরলেন। তাওফীকা এবং আইদা তার পিছু পিছু দোকানের পেছন দিকে এলেন। ওদিকটায় সামান্য ঝোপমতো। ঝোপের ওপাশেই উঁকি দিচ্ছে একটা টিনের ঘর। মানুষটা সেদিকেই যাচ্ছেন। একদম দরজার সামনে এসে হাঁক ছাড়লেন

–রইসুল! ও রইসুল!

ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ এল। বাহির থেকে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে চাওয়ালা চাচা ডেকেই চলেছেন। একসময় হুটোপুটির আওয়াজ হলো ভেতরে। ভারী পা ফেলে কেউ এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তাওফীকা হাসানের ইন্দ্রিয় যেন কোনো কিছুর সংকেত পাচ্ছে। সতর্কতা সংকেত। মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। আইদার হাতে চাপ দিয়ে কিছু বুঝাতে চাইলেন তিনি, ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল। ময়লা শার্ট আর আধছেঁড়া লুঙ্গি পরা এক বিশালকায় লোক উদিত হলো দরজার সামনে।

–কী হইছে?

খেঁকিয়ে উঠতেই লোকটার দৃষ্টি পড়ল সামনে দাঁড়ানো রমণী দুজনের দিকে। কেমন যেন একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল। তাওফীকা হাসান সে দৃষ্টির সাথে পরিচিত, খুব বেশি পরিচিত। গা শিরশির করে উঠল তার।

–এই ম্যাডামরা একটু চা খাইব। দোকানে তো বসানি যায় না, এইহানে নিয়া আসছি। তুমি একটু দোকানে গিয়া বসো। আমি উনাদের চা আইনা দেই।

বিস্ময়করভাবে লোকটা কোনো প্রত্যুত্তর করল না। নীরবে পা বাড়াল দোকানের দিকে। চাচা এবার ওদের দিকে ফিরে হাসলেন। মনে হলো, অনেক কষ্টে বের হয়েছে হাসিটা,

–আপনেরা যান। টিনের ঘর হইলেও ভেতরে লাইট আছে। লাইট জ্বালাইয়া বসেন। আমি চা লইয়া এই আসলাম বইলা...'

তাওফীকা ঠিক সেভাবেই যেন জবাবী হাসি দিলেন,

–জি, চাচা। আপনে যান। আমরা বসতেছি।

চাচা হাঁটা ধরলেন। চোখের আড়াল হতেই আইদাকে নিয়ে দ্রুত পা চালালেন তাওফীকা। টিনের ঘরটার পেছনে চলে এলেন। ওদিকটা দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেয়া। বামে সরে গেলেন। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। এরপর আবার ঝোপ। ঝোপের ওপাশে কী আছে জানা নেই তাওফীকার, তবুও আইদাকে নিয়ে সেদিকেই

ছুটলেন। একরকম দৌড়ুচ্ছেন। কেন এমন করছেন, জানা নেই। শুধু জানেন, এমন অনেক অজানা কাজ তাকে বাঁচিয়ে আনছে দীর্ঘকাল। আইদা নির্বাক বিস্ময়ে শুধু অনুসরণ করে চলেছে। ঝোপের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেছেন হয়তো, ঘরের দিক থেকে এক জোরালো কণ্ঠ বলে উঠল,

–খা....গুলা গেছে কই? ওই রহিম মিয়া, তুমি না কইলা এইখানে বসতে কইছ!

–হ, এইখানেই তো বসাইয়া গেলাম।

–তাইলে গেছে কই?

–হেরা বিনবিন করে বেশি, মনে হয় ওইদিকে ঘুরতে গেছে।

–হ, শালার পুত! এইহানে ঘুরার কী আছে! নির্ঘাত মা... ভাগছে। গইস্যায় যদি জানে, হাতে আইসাও পাখি এমনে উইড়া গেছে, আমাগোরে আস্ত রাখব না...'

–ভাগে নাই, ভাই। দেইখেন...'

ধুম করে এক আওয়াজ হলো। এরপরে আরও কয়েকটা চটাস চটাস শব্দ। এদিকে তাওফীকা আর আইদা যেন জমে গিয়েছেন। লোকগুলো যদি ওদের খুঁজতে বেরোয়! মুহূর্তেই ধরা পড়ে যাবেন! ঝোপের আরও ভেতরে যাওয়ার ঝুঁকিও নেয়া সম্ভব না। যে কোনো ধরনের শব্দ এখন জীবনের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। কী করবেন বুঝে পারছেন না। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো। ওই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই বলে বেড়িয়েছেন, এমন এমন দুটো মেয়ে আসছে এলাকায়। গইসের বাড়ি দেখবে! এক কান, দু–কান হতে হতে এরাও জেনে ফেলেছে। চাওয়ালা চাচাকে ভালো ভেবে করেছে আরেক ভুল। আরেকটু হলেই...।

আর ভাবতে চাইলেন না তাওফীকা। লোকগুলোর আওয়াজ থেমে গেছে। হয় চলে গেছে, নতুবা ঘাপটি মেরে আছে। আরও আধঘণ্টামতো চুপিসারে অপেক্ষা করে ঝোপের ভেতর দিকে যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করলেন তারা। আইদার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো ওকে হতে হয়নি, সাহস জোগানোর জন্যে ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসলেন তাওফীকা। কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। কতটা আশ্বস্ত হলো আইদা তা বোঝা গেল না, তবে প্রধানের অনুসরণ করে চলল। অল্প কিছুটা হাঁটতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল দুজনেরই! এ কি মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি? নাকি খাল কেটে কুমির? সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তাওফীকা হাসান। আইদা তো হতবুদ্ধি!

সামনেই গইস মিয়ার বাড়ি! ঘুরপথে তারা অজান্তেই গইস মিয়ার বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হয় এখন এই বাড়িতে ঢুকতে হবে, নতুবা পেছন ঘুরে ওই লোকগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। দ্বিধা করতে করতে পা বাড়ালেন তাওফীকা। গেট হা করে খুলে আছে। যেন এত বড় ডাকাতের বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি তার সাঙ্গপাঙ্গরা। তাই পাহারা পর্যন্ত নেই! নাকি তাদের জন্যে ট্র্যাপ? যাই হোক, এতে প্রবেশ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। ঢিপঢিপ করা অন্তর নিয়ে ঢুকে গেলেন দুজনই।

ভেতরে অন্ধকার। লাইট জ্বালানোর চেষ্টায়ও গেলেন না তিনি, আঁধারেই দেয়াল ধরে একদিকে এগিয়ে চলেছেন। এ ঘুটঘুটে অন্ধকারে মনেই হয় না বাইরে এখন পড়ন্ত বিকেল। সামনে কাঠের কিছু একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। হাতড়ে বুঝলেন সেলফ।

–ম্যাম! আইদার ভীত, চাপা গলায় আওয়াজ পাওয়া গেল খানিক পেছন থেকে।

–আমি তোমার সামনেই। দেয়াল ধরে এগিয়ে আসো।

তাওফীকা দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানেই। একটু পর হাতের স্পর্শ পেয়ে বুঝলেন, আইদা তাকে খুঁজে পেয়েছে। ওর হাত কাঁপছে।

–ভয় পাচ্ছ আইদা?

কোনো উত্তর এল না।

–অন্ধকার ভয় পাচ্ছ না বিপদের?

কোনো উত্তর নেই। আশেপাশে হাত বাড়ালেন। কোনো মানুষ ঠেকল না। তবে কিসের স্পর্শ ছিল একটু আগে?! নাহ! আর থাকতে না পেরে মোবাইলের লাইট জ্বাললেন। যতদূর আলো গেল, আইদাকে দেখা গেল না। যেটাকে তিনি হাতের স্পর্শ ভেবেছেন, সেটা আসলে মাকড়সা। দেয়াল থেকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যে পথে এসেছেন, ওপথেই আবার ফিরে চললেন তিনি।

বেশ খানিকটা পেছনে এসে দেখলেন আইদা অজ্ঞান হয়ে আছে! ফোমের মতো কিসে যেন ঠেকে আধশোয়া হয়ে আছে, তাই পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পাননি।

চোখেমুখে ভয় ফুটে আছে। স্বস্তিতে হেসে উঠলেন তিনি। ওফ! ভয়ে মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে! কী করা যায়? সাইড ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে আইদার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন তিনি। হুঁশ এল না আইদার। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না! ভয় জেঁকে বসল আবার মনে। এই মুহূর্তে যদি গইসের কোনো লোক চলে আসে? নাকি ওদের দিকে কেউ আড়ালে নযর রাখছে ঠিক এখুনি? পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল তার।

আইদাকে ওখানেই রেখে মোবাইলের লাইট নিয়ে দ্রুত গতিতে হেঁটে চললেন তিনি। আশেপাশে ভালোমতো আলো ফেলে বুঝলেন এটা গইসের বৈঠকখানা। বিশাল বড় ঘরটা। এত বড় যে, মোবাইলের আলো শেষ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। তবে এ তলায় যে আর কোনো ঘর নেই সেটা অনুমান করতে পারছেন তিনি। দোতলার সিঁড়িটা কোথায়? খুঁজতে শুরু করলেন।

দেয়ালে মাঝে মাঝেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে আলো ফেলছেন। একটা ওয়ালপেপারে চোখ আটকে গেল তার। এগিয়ে গিয়ে নামালেন ওটা। ভালো করে দেখতে গিয়েও দেখলেন না। হাতে নিয়েই হাঁটতে লাগলেন। অবশেষে একটা দরজার দেখা পেলেন। কিচেন। একটা সিংক আছে। সিঁড়ি খোঁজা স্থগিত রেখে আইদাকে আনতে চললেন তিনি।

টেনেহিঁচড়ে আইদাকে কোনোমতে কিচেনে নিয়ে এলেন। সিংকের নীচে আইদার মাথা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পানি ঢাললেন। এরপর হাঁপাতে লাগলেন। শক্তিতে চিড় ধরছে। এই তিনিই একসময় একটা মানুষকে কাঁধে চড়ে নিয়ে অনেকটা পথ হেঁটেছেন আর আজ আইদার মতো চিকন-চাকন মেয়েটিকেও তুলতে পারলেন না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। দেহের পাশাপাশি শক্তিরাও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হতেই হবে, অমোঘ নিয়তি! তিনি চলে গেলে তার স্বপ্নগুলো বেঁচে থাকবে তো? নাকি তার সাথে স্বপ্নেরাও বুড়িয়ে গেছে? তার সাথে স্বপ্নগুলোও কবরের মাটিতে মিশে যাবে? আইদার গোঙানোর আওয়াজে আবেগকে দূরে ঠেললেন তিনি। চোখ মেলেছে ও। ঝট করে উঠে বসল।

–ম্যাম!

–এখন ঠিক আছ আইদা?

–ওহ্, ম্যাম! আই'ম এক্সট্রেইমলি স্যরি। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভীষণ।

আশ্বাসের হাসি হাসলেন তাওফীকা।

–আসলে আমিও বুঝতে পারিনি পরিস্থিতি এমন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বুঝলে নায়লাকে নিয়ে আসতাম।

অভিমান হলো আইদার। ও কিসে অযোগ্য? এতক্ষণ কি যোগ্য সঙ্গীর মতো ও ম্যামকে সঙ্গ দেয়নি? শুধু ভয়ে পেয়ে গিয়েছিল তাই...!

–ভয় কাটেনি এখনো?

–ভয় পাচ্ছি না ম্যাম। এখন কী করব আমরা?

কাঠখোট্টা স্বরে উত্তর পেয়ে তাওফীকা বিস্মিত হলেন। হঠাৎ কী হলো আবার আইদার?

–দোতলার সিঁড়ি খুঁজতে হবে, চলো।

–ওটা বাম দিকে, ম্যাম। সেটা বলতেই ডেকেছিলাম। এরপরই...।'

ওহ! কী বোকা আমি! একদিকে হেঁটে চলেছি তো, হেঁটেই চলেছি। চলো, চলো।

–হাতে ওটা কী, ম্যাম?

–একটা ওয়ালপেপার। দেয়ালে ঝুলানো পেলাম।

ওয়ালপেপার হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কী হলো বুঝতে না পেরে ঠোঁট উল্টাল আইদা। দুইজনেই সিঁড়ির দিকে পা চালাল।

দোতলায় উঠতেই পাশাপাশি দুটো ঘর চোখে পড়ল। এরপর আলো ফেলতেই দেয়ালে একটা বিশাল বাঁধাই করা ছবি চোখে পড়ল। তাওফীকার মুখভঙ্গি পাল্টে গেল। এও হতে পারে!!

ত্বরিতগতিতে প্রথম ঘরটাতে ঢুকলেন। আগপাছ না ভেবেই সুইচ চাপলেন। তিন নম্বরে লাইট জ্বলল। ফকফকা আলোয় একটা কাবার্ড, খাট, টেবিল ইত্যাদিতে রুমটাকে সাজানো দেখা গেল। গোছালো বেশ। ওখানেও একটা ছবি। একই মানুষের। বাঁধাই করা। সাইজে একটু ছোট। এগিয়ে গিয়ে কাবার্ড খুললেন। জিনিসপত্র বের করা শুরু করলেন। যেন কিছু খুঁজছেন, পেলেন না। টেবিল হাতড়ালেন, ড্রয়ার খুললেন। এক, দুই, তিন! নাহ, কোনো ড্রয়ারেই নেই। ছুটে পাশের রুমে গেলেন। সাথে যে অন্য কোনো প্রাণী আছে সে যেন তিনি ভুলেই গেছেন! ভুলে গেছেন লাইট জ্বাললে সম্ভাব্য বিপদের কথাও! লাইট জ্বাললেন ওখানেও।

গইস মিয়ার মতো ডাকাতের বাড়িতে এমন একটা রুম দেখা যাবে সে ভাবনারও

বাইরে। রুমের চারদিক জুড়ে বুকশেলফ। বইয়ে ঠাসা। দেশি-বিদেশি, বাংলা-ইংরেজি বিভিন্ন ভাষায়। বিদ্যাই যে সব সময় মানুষ হতে শেখায় না এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গইস। কিন্তু তাওফীকা হাসান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রিডিং টেবিলটার দিকে। টেবিল ল্যাম্পের পাশে একটা ফ্রেম। তাওফীকা হাসান ওদিকেই তাকিয়ে। আইদা অবাক হয়ে দেখল তিনি কাঁপছেন। এতক্ষণের আকস্মিক উত্তেজনায় নাকি অন্য কোনো কারণ? ছবিটার দিকে গভীরভাবে সেও তাকাল। আর দশটা ফ্যামিলি ফটোর মতোই। পার্থক্য শুধু, সব ফ্যামিলি ফটোতে গইস মিয়ার মতো সন্ত্রাসী থাকে না।

কোথাও যেন হালকা আওয়াজ হলো। নাকি কানের ভুল? কান পাতল আইদা। নাহ, আর পাচ্ছে না। তবু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করছে। রুমের জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল ও, বসে পড়ে মাথাটা আলতো উঁচু করে উঁকি দিয়েছে মাত্র, আত্মাটা ধড়াস করে উঠল! বাড়ির পেছনের ঝোপে দুজন মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। তাদের এগোনোর ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, এ বাড়িতে কেউ থেকে থাকলে তাদের অজান্তেই তারা প্রবেশ করতে চায়। এখন কোথায় যাবে ওরা! আতঙ্কের একটা ঢেউ নেমে গেল আইদার পিঠ বেয়ে। তাওফীকার দিকে তাকিয়ে দেখে সম্পূর্ণ বেখবর তিনি, কেবল রুমের এপাশ আর ওপাশ ছুটে বেড়াচ্ছেন। কী হলো ম্যামের! ভাবতে ভাবতে চাপা স্বরে ডাকল,

-ম্যাম!

তাওফীকার বিকার নেই।

-ম্যাম!

উঁহু.... এবার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে আস্তে করে ধমক দিল,

-ম্যাম!!

তাওফীকা হাসানের যেন টনক নড়ল। নাকি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন?

-ইয়েস!

-দুজন লোক এ বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। সম্ভবত লাইটের আলো দেখে সন্দেহ হয়েছে।

এতক্ষণে রুমের আশেপাশে তাকালেন তাওফীকা। রুমের কী অবস্থা করেছেন তিনি! হাতে রাখা ব্যাগের দিকেও তাকালেন। ক্ষণিকের আবেগ তার ব্যক্তিত্বকে

বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। ভুল করেছেন তিনি, প্রচণ্ড ভুল! তার সেই ভুলের মাশুলে বিপদে পড়তে যাচ্ছে আরেকটি নিরপরাধ মেয়ে। নিজেকে এর শাস্তি দিতেই হবে! কিন্তু আপাতত লোক দুজন থেকে বাঁচতে হবে।

আইদার হাত চেপে ধরে নীচে নেমে এলেন তিনি, ইতিউতি তাকাচ্ছেন কোনো লুকোনো আশ্রয়ের আশায়। লোক দুজন হয়তো এখনই দরজা খুলে ঢুকে যাবে। দিশেহারা অবস্থা আইদার। আবার ওপরে উঠে এল তারা। এখানে লুকানোর প্রশ্নই উঠে না। লাইটের আলোয় সব দেখা যায়। আরও ওপরে উঠে গেলেন। ছাদের গেইটে বিশাল তালা ঝুলছে। কী করবেন! আবার নীচে নামতে যাবেন, ঠিক তখনই নীচতলায় লোকগুলোর সাড়া পেলেন। সুইচ টেপার আওয়াজ পাওয়া গেল। জায়গায় জমে গেলেন তারা দুজন।

আইদার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিন্তু চোয়াল দৃঢ়। এবার ভয় পেলে চলবে না! বাম দিকে তাকিয়ে দেখলেন ছাদের দরজার পাশে একটা ছোট স্টোর রুম। পুরোনো কার্পেট আর তোশকে ঠাসা। একটা কার্পেট টান দিলেন। ভ্যাপসা, স্যাঁতস্যাঁতে একটা গন্ধ নাকে আছড়ে পড়ল। পেট গুলিয়ে উঠল তাওফীকার। আইদার তেমন বিকার হলো না। ক'দিন আগেও সে যে নোংরা পরিবেশের একজন বাসিন্দা ছিল! ছিলেন তাওফীকাও। কিন্তু তার গল্পটা পুরোনো। অনেক বেশি পুরোনো। ভুলে যাওয়ার মতো পুরোনো। তাওফীকা কান পেতে আছেন। লোকগুলো দোতলায় উঠছে। কিছুক্ষণ হুটোপুটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

–জুনাইদ, তুমি কিছু পেলে?

–না, স্যার! দুইটা রুম এলোমেলো। আরেকটা রুম গোছালো। এর মানে যারাই আসুক, সবগুলো রুম খুঁজে দেখার সুযোগ পায়নি অথবা খোঁজার প্রয়োজন হয়নি। যা চেয়েছিল, পেয়ে গেছে।

–তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কী খুঁজেছে লোকগুলো?

–আই হ্যাভ নো আইডিয়া, স্যার। কারা হতে পারে, তাও বুঝতে পারছি না।

–গইসের লোকেরা হবে না শিওর। বিকজ, তারা লুকোবে না; বরং আমাদের বাধা দেবে। গইসও আসেনি। এলে হয়তো বাড়িতে ঢুকতেই পারতাম না। গইস

তাহলে গেল কোথায়! এত লং টাইম তো সে কোথাও গিয়ে থাকে বলে রিপোর্টে উল্লেখ নেই।

–বিল্ডিংটা কি আবার সার্চ করব, স্যার?

–ইয়াপ! একদম তন্ন তন্ন করে খোঁজো। কিন্তু কিছু সরাবে না। ইম্পর্ট্যান্ট জিনিসগুলোর ছবি তুলে নেবে। তুমি কি খেয়াল করেছ টেবিলের ওপর থেকে ছবির ফ্রেম, আলমারি থেকে কিছু পেইন্টিং উধাও। এর মানে লোকগুলো এর খোঁজে এসেছিল। আরও কী কী সরিয়েছে দেখে নাও।

–ইয়াপ! বাট এগুলোর কী গুরুত্ব থাকতে পারে স্যার?

–জানা নেই। আপাতত বকবকানি স্টপ করে সার্চ করো। কুইক! আর কোনো কথা নেই। কেবল নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

তাওফীকা আর কোনো উপায় না দেখে স্টোর রুম থেকে আরও একটা কার্পেট সরালেন। একটুখানি ফাঁক হলো। নির্দ্বিধায় আইদাকে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে গেলেন ওই ফাঁকে। এরপর কার্পেট দুটো টেনে এনে নিজেদের ওপর দিলেন। কেবল চোখ দুটো বের হয়ে থাকল। সরাসরি লাইট ফেললেও চোখ দুটোকে ট্রেস করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। এখন শুধু পড়ে থাকা আর লোক দুজনের যাওয়ার অপেক্ষা করা। এই দুর্গন্ধের মধ্যেও আইদা ফিসফিস করে উঠল, 'ম্যাম!'

–ইয়েস!

–ওই ছবিগুলো কার? পেইন্টিংগুলোই–বা কার? আপনি এগুলো নিচ্ছেন কেন? হড়বড় করে এতক্ষণ জমিয়ে রাখা সব প্রশ্ন বের হয়ে এল আইদার মুখ দিয়ে। তাওফীকা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আইদা দ্বিধায় পড়ল, 'স্যরি, ম্যাম। আমি কোনো কষ্ট দিতে চাইনি।'

–না, আইদা। তুমি কোনো কষ্ট দাওনি। এ এলাকায় এসেছি আমরা কত সময় হলো? দুপুর থেকে এখন সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই। এ সময়টুকুর মধ্যে আমি পেরিয়ে এসেছি কতটা পথ সে কি তুমি জানো?

বলে আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তাওফীকা।

–ছবিগুলো গইস মিয়ার আর তার বাবা শাকিল সাহেবের। সাথে যে ওই পিচ্চি মেয়েটা দেখছ না? সে মেয়েটা আজকের এই আমি। আর এই দেখো', তাওফীকার স্বর আর্দ্র হয়ে উঠল, 'এই পেইন্টিংগুলো আমার করা। একটা সময় এই করেই

দিন পার করতাম।'

আইদার সব কেমন এলোমেলো মনে হলো। কোথায় ডাকাত আর কোথায় ম্যাম! কিসের পরিচয় এদের সাথে ম্যামের! তাওফীকার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আইদা। কিন্তু তাওফীকা তো এখানে নেই। ফিরে গেছেন দুই যুগেরও আগের সময়টাতে। যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন শাকিলের কাছে।

শাকিলের বাড়িতে ভালোই কাটছিল তিতিনের দিনকাল। বাড়িতে ছিল শাকিল, একজন বুড়ো লোক আর সে। বুড়ো লোকটি সময়ে সময়ে খাবার দিত, এটা সেটা এনে দিত। পনেরো দিনেও তিতিন তার মুখে শব্দ শোনেনি, যেন হুকুম তামিল করার রোবট। ওর সঙ্গী ছিল শুধুই শাকিল। শাকিলের মেধায় ছোট্ট তিতিন ছিল মুগ্ধ। হেন প্রশ্ন নেই যার উত্তর শাকিলের জানা নেই। সে অবাক চোখ মেলে ভাবত, এত জ্ঞানী একজন মানুষ ডাকাত কেন! একদিন জানতেও চেয়েছিল। শাকিল হেসে বলেছিল,

–তুই এখনো খুব ছোট রে মা! বড় হলে দেখবি পৃথিবীটা কতটা কঠিন!

সেই তিতিন আজ বোঝে কতটা সত্যি কথা বলেছিল সন্ত্রাসী শাকিল। শাকিলই ওকে পড়াত, সেই ওকে নিয়ে খেলত।

ও যেমন শাকিলের মেধায় মুগ্ধ হতো, শাকিল তেমনি মুগ্ধ হতো ওর আর্টের হাত দেখে। মাঝে মাঝে বলত, 'যদি আমি পলাতক না হতাম, তাহলে তোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতাম!'

অল্প ক'দিনের জন্য এ বাড়িতে এসেছিল শাকিলের ছেলে গিয়াস। আজকের গইস মিয়া। গিয়াস আর তার মা গ্রামে থাকে। কিন্তু আচার-আচরণে সে একজন ফিটফাট ভদ্র ছেলে। কথাবার্তায় বোঝা যায়, প্রচুর পড়াশোনা করে সে। দুজনে মিলে খুব গম্ভীর গম্ভীর আলাপ করত।

সে অল্প ক'দিনের সঙ্গতেই ওরা দুজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। ওরা শব্দ নিয়ে খেলত, শাকিলের দেয়া বই নিয়ে কাড়াকাড়ি হতো। দুদিন ওদের বাইরেও নিয়ে গিয়েছিল শাকিল। সে দিনক'টা কেমন স্বপ্নের মতো কাটল তিতিনের। কিন্তু যেভাবে হঠাৎ এসেছিল সেভাবেই হঠাৎ চলে যায় গিয়াস। আবারও সেই তিন—শাকিল, বৃদ্ধ

আর তিতিন।

তাওফীকা আজও জানেন না, কেন শাকিল তাকে এত স্নেহ করত! কেবল মাঝে মাঝে একা লাগত। শাকিলের পিতৃসুলভ, বন্ধুসুলভ আচরণও তাকে শূন্যতা থেকে বের করে আনতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝেই মেঝোতে, রুমের দেয়ালে এঁকে চলত কচি মনে আঁকা মায়ের স্মৃতি। ওর মনে মাকে নিয়ে কোনো দুঃখের স্মৃতি নেই।

মায়ের মৃত্যুও ওকে পীড়া দেয় না। ও জানে, মা ছুটি নিয়েছেন। দুনিয়ার কষ্ট ছেড়ে পরপারের সুখের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। ও জানে, মা কত কষ্টে ছিলেন। তাই তো যখন স্কুল থেকে ফেরার পথে সলীম শেখ শক্তমুখে জানিয়েছিল ওর মায়ের মৃত্যুর কথা, আত্মহত্যার কথা; ও বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয়নি। বড় অদ্ভুতভাবে যেন একটু খুশিই হয়েছিল। মা দুনিয়ার যন্ত্রণা থেকে ছুটি পাচ্ছেন। এখন আর মায়ের কষ্ট নেই! কোনো কষ্ট নেই!

সেই প্রথম আত্মহত্যার সাথে পরিচয় তিতিনের। সুন্দর পরিচয়। ইতিবাচক এক দেখা। তখন থেকেই যেন আত্মহত্যার সাথে ওর এক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। প্রেম প্রেম সম্পর্ক। আত্মহত্যার সাথে প্রেম! তাওফীকা শিউরে ওঠেন! সে প্রেম যে বড় ভয়ংকর! ভয়ংকর সুন্দর!

পুলিশ ওকে মায়ের লাশ দেখতে দেয়নি। লোকমুখে শুনেছে মায়ের চেহারা নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল। জিহ্বা বেরিয়ে পড়েছিল আধহাত। মাকে নাকি দেখতে ভয়ংকর লাগছিল। তিতিন বিশ্বাস করেনি। ওর মাকে এমন লাগতেই পারে না! ওর কাছে মা মানে সুন্দরী এক নারী। ভালোবাসা-মাখা, মায়াভরা এক মুখ। মায়ের নীল তোয়ালেটাও পুলিশ খুঁজে পায়নি। যে তোয়ালে জড়িয়েই মৃত্যুকে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিতিন জানে মজনু শেখ সরিয়ে ফেলেছিল তা। তিতিনের জন্যই। সেটা তিতিন যেমন আগলে রেখেছে, তাওফীকাও আগলে রাখেন। কখনো তীব্র কষ্টে ভুগলে সে তোয়ালে জড়িয়ে গন্ধ শোঁকেন। যেন অদৃশ্য থেকে মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, 'ওরে! ভয় পাস নে! আমার মতো হেরে যাস নে! সেদিনটায় তিতিন হারিয়েছিল মাকে। ঘরে সলীম শেখের ষড়যন্ত্র করে রেখে দেয়া মাদকের অভিযোগে জেলে যায় মজনু শেখ। একরকম সেদিনই হারিয়েছিলেন তাকেও। একা তিতিনের আশ্রয় ছিলেন শাকিল। কিন্তু...!

শাকিল বেশিদিন সেখানে থাকেনি। ঢাকায় চলে গিয়েছিল বোনের বাড়িতে। পুলিস

তখন তাকে খুঁজছে। যখনতখন গ্রেপ্তার হয় অবস্থা। কী অভিযোগে খুঁজছে সেটা জানা ছিল না তিতিনের। শুধু জানত, ও এখন শাকিলের বোনের আশ্রিতা। শাকিল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কখনো এখানে, কখনো সেখানে। বোনকে ভালোভাবে বলে গেছেন, তিতিন তার জন্যে অনেক দামি কিছু। তার জীবন বাঁচিয়েছে ও। ওর দেখাশোনা করতে। হয়রানিটা বন্ধ হলেই ওকে সরিয়ে নেবেন তিনি আর বোনকে খুশি করে দেবেন। কিন্তু তাতে কী! তিতিন সেখানে আশ্রিতাই ছিল। বিনে পয়সার বাঁদি ছিল। রান্নাটা করতে পারত না বলে শুধু ওইটুকুন ছাড় ছিল। ঘরমোছা, ঝাড়ু দেয়া, ওষুধ এনে দেয়া টুকটাক সব ফরমায়েশ মানেই ডাক আসা—তিতিইন্যি!

ওর কান্না আসত। কিন্তু কোথায় যাবে ভেবে চুপ করে থাকত। ওর তো যাওয়ার ঠিকানা নেই! বেঁচে থাকার উপায় নেই! এভাবে কেটে গেল কয়েক মাস। মায়ের মৃত্যুর পর কতদিন যে কেটে গেল! তার হিসেব কে রাখে! পুরোটা সময় তিতিনের জীবনটা আঁধারেই জমে আছে। আলোর কোনো চিহ্নমাত্র নেই। বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে পরিচিত তিতিন যেন এই ক'মাসেই বড় হয়ে উঠেছে। বুঝতে শিখেছে অনেক কিছু।

শাকিল চুপিসারে হঠাৎ খুব রাতে উদিত হতো ওর খোঁজ নিতে। ও হাসিমুখে বলত, 'ভালো আছি।' শাকিল যেন শুধু এই দুই শব্দ শুনতেই আসত। এরপরই চলে যেত। বোন বলত, 'আপদ গেছে!'

তিতিন চলে আসত তার রুমে। রুম বলতে ছোট্ট এক খাঁচা। কিচেনের পাশে ছোট্ট এক স্টোররুম। আলু, মুলা আর পেঁয়াজের পাশেই ওর ঘুমানোর ছোট্ট জায়গা। সেটুকুই ওর দুনিয়া। ঘুমের সময়টুকুই ওর বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। ও শুয়ে শুয়ে ভাবে, একদিন ওর আম্মুর কাছে যাবে। আম্মু ওকে নদীর পাড়ে নিয়ে ঘুরবে। শাকিল আঙ্কেল একদিন ওকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। ও আবার পড়াশোনা করবে। এসব ভাবতে ভাবতেই ও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মাঝে সুন্দর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন ভেঙে গেলেই ওর দুঃস্বপ্ন শুরু হয়। শুরু হয় বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

শাকিলের সেই বোনের এক ছেলে ছিল। রিমেন। পড়াশোনা কিছু করত না, সারাদিন শুধু পাড়ার ছেলেদের সাথে আড্ডা দিত আর সিগারেট ফুঁকত। হয়তো অন্য নেশাও করত, কিন্তু সেটা ছিল গোপনে। বয়স পনেরো মতো হবে। যদিও উচ্চতা আর স্বাস্থ্যে আঠারো বছরের কম মনে হয় না। ওর একটা যোগ্যতা ছিল। অঙ্ক অসম্ভব ভালো পারত। স্কুলের পক্ষ হয়ে কয়েকবার জেলা পুরস্কারও জিতে নিয়েছে। এহেন অমনোযোগী ও বখাটে ছেলে কী করে অঙ্কে এত ভালো হতে

পারে সে এক বিস্ময়! এ বিস্ময়ই স্কুলের পুঁজি, তাই শত অনিয়ম সত্ত্বেও স্কুল থেকে এখনো টিসি পায়নি সে; বরং অন্য সকল বিষয়ে ফেল করার পরও শুধু অঙ্কের জোরে ও এখন ক্লাস এইটে। কয়েকবার করেই পড়া হয়ে গেছে তার বিভিন্ন ক্লাস।

সন্ধ্যের পর রিমেন বাড়ি ফিরত। মাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে পেট পুরে খেত। এরপর কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেত। কী কী যে লিখত সে-ই জানে। গভীর রাত পর্যন্ত চলত ওর এই লেখালেখি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অঙ্ক কষে চলত। এতটুকু বিরক্তি নেই যেন!

তিতিন রিমেনকে এড়িয়ে চলত। ওর চাহনিটা কেমন যেন। গা গুলিয়ে ওঠে। সব সময় অবশ্য পারত না। নাস্তা এগিয়ে দিতে তো ওরই যাওয়া লাগত। কোনোমতে দিয়েই ছুট। একদিন রিমেন ডাক দিল,

–এই ছুঁড়ি, এদিকে আয়!

গুটিগুটি পায়ে রিমেনের ঠিক দুই হাত দূরে এসে দাঁড়াল তিতিন।

–আরও এগিয়ে আয়!

আর চার আঙুল এগুলো ও। ভয় কাটানোর জন্যে গুনতে শুরু করল রিমেনের টেবিলে কতগুলো বই আছে।

–তুই আমাকে ভয় পাস?

এ আবার কেমন প্রশ্ন! যাকে ভয় পায় তাকে কি কখনো বলা যায়, 'আমি আপনাকে ভয় পাই?' আর যাকে এ কথা বলা যায়, তাকে কি আদৌ ভয় পাওয়া হয়!

–এই ছেমড়ি!

যেন মেঘ গুড়গুড় করে উঠল। তিতিন ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। রিমেন আরও খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। এরপর বলল, 'যা ভাগ!'

আক্ষরিক অর্থেই তিতিন ভাগল। সময়ের একটা ভালো দিক হলো, এটা কেটে যায়। ভালো বা মন্দ। স্থির থাকে না। তিতিনের সময়গুলোও কেটে যাচ্ছিল। স্থির ছিল না। কেবল স্থির হয়ে ছিল ওর জীবনের চাকা।

এরই মাঝে খবর এল শাকিল গ্রেপ্তার হয়েছে। তিতিনকে খবরটা দেয়ার সময় চিকচিক করছিল তার বোনের চোখ। শাকিলের নামে যে সমস্ত অভিযোগ, তাতে

মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন নিশ্চিত। তবেই তো কেল্লা ফতেহ! সব সম্পত্তি একার তার। অঢেল সম্পদ। তিতিনের পা মাটিতে আটকে গিয়েছিল। টলে ওঠা পা বলছিলো—ধরণি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে লুকিয়ে আশ্রয় খুঁজি!

কিন্তু বিপদ যখন আসে, বাচ্চা-কাচ্চাসহ আসে। ধরণিও তাই ওকে কোনো ঠাঁই দিল না। বোনের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। রান্না করতে পাঠানো শুরু করল এবার। বিস্বাদ হলে খুন্তির ছ্যাঁকা আর অশ্রাব্য গালাগাল। রিমেনও যেন বেপরোয়া হয়ে উঠল। একা পেয়ে একবার হাত ধরে টেনে জাবড়ে ধরেছিল ওকে। শক্তিহীন তিতিন চিৎকার করে, কামড়ে দিয়ে কোনোমতে ছাড়িয়েছিল নিজেকে। নাহ্! এভাবে বাঁচা যায় না। ও পালাবে। হ্যাঁ, আবার পথে ফিরে যাবে ও।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিন দিনের মাথায় তিতিন পথে বের হওয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিল। ব্যাগ গুছিয়ে ফেলল রাতের আঁধারে। ব্যাগ বলতে ওর জীর্ণ, কোথাও কোথাও ছেঁড়া দুই সেট থ্রি-পিস; কিছু কাগজ, ওর আঁকিবুঁকি—বেঁচে থাকার আরেক অনুপ্রেরণা। সব গুছিয়ে শুয়ে পড়ল। আসন্ন মুক্তির উত্তেজনায় চেহারা জ্বলজ্বল করছিল। ঠিক সে সময়, সে সময়...!

ঝাঁকি দিয়ে উঠল তাওফীকা হাসানের শরীর। ঘেমে নেয়ে মনে যেন দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে উঠেছেন। হ্যাঁ! দুঃস্বপ্নই তো! সেদিন মাথায় রিমেনের হাতের স্পর্শের কথা মনে হলে এখনো গা গুলিয়ে ওঠে। সে রাতের প্রতিটি প্রহর ছিল তার জন্যে একেকটি মৃত্যু। ছোট হলেও তিনি বুঝেছিলেন এমন কিছু হচ্ছে যা হওয়া উচিত নয়। তার চিৎকারেও কেউ এগিয়ে আসেনি। দুর্বল তিতিন পিশাচ রিমেনের কাছে হার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেদিনের সূর্যটা তাই তিতিনের কাছে ছিল দুর্বোধ্য এক অনুবাদ, যা ব্যক্ত করার শব্দ তার কাছে নেই; ছিল অতি উত্তপ্ত, যার প্রচণ্ডতা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

পুরো একদিন তিতিন ওভাবেই পড়ে ছিল, কেউ উঁকিও দেয়নি সে বেঁচে আছে না মরে গেছে দেখতে! রাতে পালিয়েছিল তিতিন। হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মাথায় উঁকি দেয় সমাধান। ও খুঁজে পায় সব কষ্ট থেকে মুক্তির দিশা, জীবনের সব আঁধার পেরিয়ে আলোর পথ।

আত্মহত্যা। শুধু কয়েক মিনিটের কষ্ট। সে কষ্ট নিশ্চয়ই এ কষ্ট থেকে বেশি হবে না।

এরপর?

এরপরই মুক্তি।

থাকবে না মা হারানোর ব্যথা। সে তো ফিরছে মায়ের কোলেই!

থাকবে না বাবার অনাদর, অবহেলা। সে তো যাচ্ছে চির আনন্দের দেশে!

থাকবে না খালা কিংবা রিমেন। সে তো যাচ্ছে তাদের থেকে বহুদূরে!

আনন্দে তার চোখ চিকচিক করে উঠল।

কত সহজ!

কত সুন্দর!

সেই প্রথম তার আত্মহননের চেষ্টা। তার কাছে সেটা ছিল মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ। মায়ের কোলে মাথা গুঁজে কাঁদার একমাত্র রাস্তা!

জনসন রোডের সবাই সেদিন দেখেছিল, কাঁধে স্কুলব্যাগ ঝুলিয়ে পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে এক কিশোরী। ময়লা ও জীর্ণ পোশাক পরা কিশোরীর পিঠে স্কুলব্যাগ নজর কেড়েছে অনেকেরই। এদের একজন হলেন রফিক মিয়া।

আনসারের মতো ইউনিফর্ম পরা গেইটম্যান রফিক মিয়া খুব কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির দিকে। তারও এ বয়সী এক মেয়ে আছে। তার মেয়ের পোশাকও এই মেয়েটির পোশাক থেকে ভালো, সে জন্যেই এ পোশাকের মেয়েটির কাঁধে এত দামি একটা ব্যাগ বেমানান লাগল তার কাছে। কিশোরীটি কি তবে চোর? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে তার চোখ গোল হতে লাগল। করছে কী মেয়েটা!!

তিতিন ক্লান্ত শরীরটাকে আর টানতে পারছে না। যাবে কোথায়? আশ্রয় নেই। খাবে কী? খাদ্য নেই। বেঁচে থাকবে কী করে? শক্তি, সাহস কোনোটিই নেই। ধীরে ধীরে তার চোয়াল দৃঢ় হলো। কিছুটা স্বস্তিও পেল যেন। হ্যাঁ! সে পারবে। পারতেই হবে তাকে। এই তো কিছুক্ষণ, এরপরই শান্তি! আহ!

সামনেই এক সেতু। সেতুর নীচটায় চলে গেল সে। এদিক ওদিক তাকাল। নাহ! কেউ দেখছে না। তার ব্যাগটাকে পেটের সাথে ভালোমতো বাঁধল যেন কোনো রকম ধস্তাধস্তিতেও খুলে না যায়। তারপর আস্তে আস্তে পানিতে নামল।

নামতে থাকল, নামতেই থাকল। হতাশ হলো! গভীর পানিতে যাচ্ছে না কেন! এই পানিতে মরবে কীভাবে! বয়সটা আরেকটু বেশি হলে ও বুঝত মরতে হলে ওকে সেতু থেকে লাফ দিতে হবে! তবুও কিছুটা নামল ও। এবার পানি বুক পর্যন্ত। আর দুয়েক পা বাড়ালেই গভীর পানি হতে পারে ভেবে আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু পা বাড়াতেই কেমন একটা আতঙ্ক ভর করল ওর মনে। পায়ের নীচে হালকা পানির স্রোত টের পেল।

অবশেষে!

ও মরতে যাচ্ছে!

একটু পরই ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে!

সব চিন্তার শেষ!

মৃত্যু!

এই এক শব্দই কেন যেন ওর কচি মনকে একটু কাঁপিয়ে দিল। যত এগিয়ে যাচ্ছে, এক ভয় জন্ম নিচ্ছে মনে। একসময়ে পা আর এগোলো না। সবকিছুকে ছাপিয়ে মৃত্যুভয় প্রবল হয়ে উঠল। একটু আগের স্বস্তি সম্পূর্ণ উবে গেছে, মারা না গেলে কীভাবে বাঁচবে সে চিন্তাও বিলকুল নেই হয়ে গেছে। এখন কেবল একটাই চিন্তা—ওকে বাঁচতে হবে!

ও ফিরে দাঁড়াল। পাড়ের দিক পা বাড়াল। কিন্তু এ কী! পেছনের ভারী ব্যাগ ওকে উল্টোদিকে টানছে। ও সামনে পা বাড়ায়, কিন্তু স্রোত আর ব্যাগের ওজন ওকে পেছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পানি এখন নাক পর্যন্ত।

ওকে বাঁচতে হবে!

দুই হাত দিয়ে আকুলভাবে ও ব্যাগের প্যাঁচ খুলতে চাইছে। গিঁট আটকে গেছে ভালোভাবেই। ও পুরো ডুবে গেল। তারমানে ও মারা যাচ্ছে?!

মৃত্যু এত কষ্ট!

ওর চোখ বেয়ে পানি ঝরতে চাইল, তাও পারল না।

শ্বাস নেয়ার জন্যে নাক টানল ও। নাকে-মুখে গলগল করে পানি ঢুকে গেল। অসহ্য কষ্ট!

শ্বাস নেবে ও! শ্বাস!

শ্বাস যত টানছে, এক তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা পুরো শরীরে-মনে ছড়িয়ে পড়ছে!

একটু বাতাস!

এরপর সব অন্ধকার।

আইদা অবাক হয়ে দেখল তাওফীকা প্রচণ্ডভাবে ঘামছেন। 'ম্যাম', ফিসফিসাল ও।

–এঁ, হ্যাঁ...।

আঁতকে উঠলেন যেন তাওফীকা। শ্বাস নিতে লাগলেন বড় বড় করে।

–আর ইউ ওকে, ম্যাম?

–এঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ! আ'ম ওকে!

আইদা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ম্যাডামকে ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ দিল।

'আইদা!' বেশ কিছু পর তাওফীকার নরম কণ্ঠে ডাক শুনল আইদা।

–ইয়েস, ম্যাম!

–ছোট ছোট অনেক মানুষ আছে, যারা অনেক বড় মানুষের জীবন গড়ে দেয়। বড় হয়ে সেই ছোটদের সবাই ভুলে যায়। কিন্তু একাকিত্বের সময়টাতে তারা অনুভব করে, সেই ছোটরা তাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসে। যেন বলতে চায়—আমার অবদান তুমি ভুলে গিয়েছ অথবা ভুলে যাওয়ার অভিনয় করছ। তুমি কী ভাবছ, কৃতিত্ব অস্বীকার করলেই আমার ভূমিকা ফিকে হয়ে যাবে? আমাকে অস্বীকার করে কি তুমি খুব ভালো আছ? অথচ এই দেখো! তোমার স্বীকার বা অস্বীকারে আমার কিছুই আসে যায় না। এই যে আমার স্বাভাবিক জীবন, খুব সুন্দর চলে যাচ্ছে। আমি তোমার চেয়ে কি ভালো নই?

–জি, ম্যাম।

বিস্মিত হলো আইদা। হঠাৎ এমন দার্শনিক হয়ে গেলেন কেন তাওফীকা?

–আমার জীবনেও এমন একজন ছোট মানুষ আছে, যাকে আমি ভুলে যাওয়ার অভিনয় করছি। সামান্য এক দারোয়ান। একটা সময় আমার জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি। এরপর মালিকের একটা রুমে আমাকে লুকিয়ে থাকার মতো আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। আমাকে বোঝাতেন, বেঁচে থাকার উৎসাহ জোগাতেন। আমি আঁকাআঁকি করতে

পারি জেনে আর্ট পেপার, পেন্সিল, জলরং এনে দিতেন। আমাকে ভরসা দিতেন, তিনি ভালো বেতনের একটা চাকরির ব্যবস্থা করবেন। তখন আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। ততদিন একটু ধৈর্য ধরতে। এ সময়টাতে পড়াশোনা চালানোর জন্যে তিনি একটা-দুইটা করে বই এনে দিতেন।

এভাবেই কেটে গেল প্রায় আট মাস। হঠাৎ একদিন! আমার কী হলো কে জানে! পালিয়ে গেলাম তার কাছ থেকে। জীবনের ডাকে। অন্ধকার ঘরটায় আমার জীবনটাও যেন কালিগোলা হয়ে যাচ্ছিল। এই অন্ধকারের মাঝেই একদিন আশার আলো দেখেছিলাম।

দারোয়ান চাচা এসে বললেন, একটা জায়গায় শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে। বিজয়ীকে দেয়া হবে ত্রিশ হাজার নগদ অর্থ এবং সেই সাথে পরবর্তী কমার্শিয়াল প্রদর্শনীতে বিনামূল্যে অংশগ্রহণের সুযোগ। শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছিল, এই তো আমার জীবন! আমাকে আর পড়ে থাকতে হবে না! কিন্তু দারোয়ান চাচার আরেকটি কথা আমার আশার আলো নিভিয়ে দিল। রেজিস্ট্রেশন ফি তিন হাজার। আমার কাছে তো তিন পয়সাও নেই।

আমার মুখ কালো দেখে দারোয়ান চাচা আশ্বাস দিলেন, 'চিন্তা করিস না, আমি আছি তো! কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছিলাম এই টাকা সংগ্রহ করাটা কত কঠিন হবে চাচার জন্যে। পরদিনই আমি পালালাম। এর আগেই চাচার কাছ থেকে আমি ঠিকানা নিয়ে নিয়েছিলাম। তাওফীকা আচমকা থেমে গেলেন।

-পরে, ম্যাম?

উৎসুক স্বর শোনা গেল আইদার। আজ বেশ খুশি লাগছে ওর। কঠিন আর অন্তর্মুখী এই ম্যাডামের জীবন সম্পর্কে জানে খুব অল্প মানুষই। এমনকি সাক্ষাৎকার দেয়ার সময়ও ম্যাডাম নিজের জীবনের বেলায় যথেষ্ট কিপ্টেমি করেন। তার জীবনের গল্প শুনতে পেরে তাই খুব গর্বিত বোধ হচ্ছে।

-হুঁ? ও হ্যাঁ। ওখান থেকে পালিয়ে আমি সে ঠিকানাটায় যাই। দারোয়ানকে অনুরোধ করি, আমাকে পরিচালনা কমিটির কারও সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। দারোয়ান আমার পোশাক দেখেই ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমি বারবার বারবার রিকোয়েস্ট করেও কারও সাথে দেখা করতে পারিনি। ফিরে গেলাম। বিকেলে আবার এলাম। দারোয়ান দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে গিয়েও কী ভেবে যেন দিল না, তবে ঢুকতেও দেয়নি। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ঘণ্টা... দেড় ঘণ্টা... আমি দাঁড়ানো।

দু–ঘণ্টার মাথায় একটা প্রাইভেট কার বেরিয়ে এল গেইট দিয়ে। দারোয়ান আমাকে ইশারায় বোঝাল, তাকে গিয়ে ধরতে। আমি ছুটে জানালার কাচে টোকা দিলাম। স্যুট পরা মানুষটা মাথা বের করে দারোয়ানকে ধমকে উঠলেন, এরপর আমাকে বিশ টাকা ধরিয়ে দিলেন। টাকাটা আমি ফেরত দিলাম। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমাকে ভিখিরিই ভেবেছিলেন। কিন্তু যখন তাকে প্রতিযোগিতার কথা বললাম, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ কথা এল না মুখ দিয়ে। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলেন,

–ভিখারির বাচ্চা! তামশা পাইছস!

রাগে মুখে থু থু ছিটে এল। আমি চুপ করে রইলাম।

–এহনই বাইর হ ফইন্নী! মজিদ, তোমারে কিন্তু আমি চাকরি থেইকা বাইর কইরা দিমু! দিন দিন তুমি বাইড়া যাইতাছ।

দারোয়ান অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বলতে নিলাম,

–স্যার, উনি...।

–তুই এখনো যাস নাই!...

আমি ছুটে পালিয়ে গেলাম। দিনের আলোয় পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভদ্রলোকদের চেহারাগুলো নির্জনতায় যে কতটা বিশ্রী হতে পারে, আমি জীবনের শুরুতেই তা বুঝে গেলাম। বাইরে এসে আমি হাঁপাতে লাগলাম। ওদিকে পেটে ক্ষুধা, খাবার কীভাবে জোগাড় করব বুঝছিলাম না। এদিকে বুকে পুষে রাখা একমাত্র আশায় গুঁড়ে বালি। এইটুকুন আমি তা কীভাবে সয়েছিলাম, এখনো ভেবে কুলোতে পারি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কী করব এখন? চাচার কাছে ফিরে যাবো? নাকি না খেয়ে মরবো? নাহ! চাচার কাছে যাব না। সে জীবন যে খুব সুখের ছিল, সে তো নয়। এর চেয়ে বরং মৃত্যুই ভালো। আত্মহত্যার ঝোঁক চাপল মাথায়। কিন্তু মৃত্যুভয় আমাকে এতটাই কাবু করেছিল যে, সাহস করতে পারিনি।

আমি পথেই বসে গেলাম। ক্লান্তিতে চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। ঠিক এমন সময় কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ পেলাম। চমকে তাকালাম,

–ওই ছেমড়ি! বছর বারোর এক কিশোর আমার পেছনে।

–তুই কই থাকস?

আবার জিজ্ঞেস করল সে, আমি মাথা নাড়লাম।

–মাথা নাড়স ক্যা? কবি না?

–আমি এইখানেই থাকি। এতক্ষণে আওয়াজ বেরুল গলা দিয়ে।

–এইখানে থাকি মানে কী! এই পথে থাকস?

–হুঁ, এই পথেই থাকি।

–আমাগো লগে থাকবি?

আশার আলোয় জ্বলে উঠব। সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করলাম না।

–কই থাকো তোমরা?

–ওই সামনের বস্তিতে। সতেরো জন এক ঘরে থাকি। সবাই আমার মতো। তুইও থাকতে পারবি।

–ওখানে খেতে পাব?

–তোর খিদা লাগছে?

আমি মাথা নাড়লাম। ছেলেটা, 'আয়' বলে হাঁটা শুরু করল। আমিও গেলাম পিছু পিছু। একটা টং দোকানের সামনে গিয়ে থামল।

–চাচা, দুইটা রুটি আর একটা কলা দেন। ছেলেটা দোকানি থেকে নিয়ে আমার হাতে দিল।

খাবার দেখে যেন ক্ষুধা চাগিয়ে উঠল। আমি গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। অথচ এই খাবার আমি মোটেও খেতে পারি না। সেদিন আমি বুঝলাম, খাবারের অভাবে মানুষ কতটা অসহায় হয়ে পড়ে। আমার খাবার দেখে ছেলেটার মায়া হলো বোধহয়।

–আরও খাবি? আমি মাথা নাড়লাম আবারও। এবার কেক কিনে দিল ও। সেটা খেয়ে পানি খাওয়ার পর মনে হলো জীবন সুন্দর। জীবন বেঁচে থাকার।

–চল্ আমার লগে।

–কোথায় যাব?

–আমাগো বস্তিত। তয়....।

–কী?

–তোর কাম করন লাগব।

–কী কাজ?

–সেইটা তো জানি না। আমরা কেউ কাগজ টোকাই, কেউ গাড়ির কাচ মুছি, কেউ পেপার বেচি। রাইতের বেলা ওস্তাদরে সব ট্যাকা দিয়া দিতে হয়। ওস্তাদই আমগোরে থাকা-খাওয়ার ট্যাকা দেয়। এয়ে মানুষটা মন্দ না। তয় রাগ উঠলে অমানুষ হয়া যায়।

একজন লোক! আমার রিমেনের কথা মনে হলো। ভয়ে শরীর শিউরে উঠল।

–ওস্তাদ কি তোমাদের সাথেই থাকে?

–না, ট্যাকা লইয়া আবার কই জানি যায়গা।

–মেয়ে কয়জন?

–নয় জন।

–তাদের কোনো সমস্যা হয় না?

–শালা! কুন বাইঞ্চোতের পুতে সমস্যা করব? ওস্তাদও ডরায় মাইয়াগোরে। ওরা আমগো বইন। আমাগোরে শাস্তি দিক, মারুক। আমগো বইনগোরে কিছু কইলে শালার...।

কী করবে সেটা আর শেষ করল না ছেলেটা। আমি তার সাথে যাব বলে মনস্থির করে ফেললাম। আসলে মনস্থির করার কিছু ছিলও না। আমার সামনে এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর জানতে চাইলাম, 'তোমার নাম কী?'

–সাইফুল।

এইটুকু পর্যন্ত বলে তাওফীকা বেগম থেমে গেলেন। আইদা রেগে গেল। এখানে এসে থামার কোনো মানে হয়!

–ম্যাম! পরে? উত্তরে কেবল দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। নরম স্বরে আওয়াজ এল, 'এর কোনো পর নেই আইদা। কিছু কিছু শুরুর শেষ থাকে না। এ গল্পেরও শেষ নেই। অসমাপ্ত কত গল্প নিয়ে নিত্য...।'

আইদা আর জিজ্ঞেস করল না। হয়তো কোনো অব্যক্ত যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন জীবনের ওই অংশটুকুকে ঘিরে। আইদা নিজেও জানে না কতটা সত্য ভেবেছে সে!

–ম্যাম! লোকগুলো বোধহয় চলে গেছে।

পেছনের পাতাগুলো উল্টাতে থাকা তাওফীকার হিসেবই নেই, এরই মাঝে পেরিয়ে গেছে দু-ঘণ্টা।

–হুমম! কিন্তু আমরা বের হব কীভাবে আর যাবই-বা কীভাবে!

বলে গায়ের কার্পেট সরাতে লাগলেন তাওফীকা। আইদাও হাত লাগাল। দুইজনেই খোপ থেকে বেরিয়ে এলেন। খুব সাবধানে পা ফেলে দোতলায় নামলেন। লোক দুজন সম্ভবত আইনের লোক ছিল। তারা চলে গেছে। কিন্তু গইসের লোক আসার সম্ভাবনা চলে যায়নি। তারা যখন তখন আসতে পারে।

–আইদা, এখানে আমাদের আর দেখার কিছু নেই। যত দ্রুত সম্ভব সামনের গেইট খুঁজে বের করে বেরিয়ে যেতে হবে।

–কিন্তু ম্যাম, সামনে তো গইসের লোক থাকতে পারে। আর পেছনে জংলা আর সেই লোকগুলো।

–বাইরে তো এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কথা। অন্ধকারে চোখ ফাঁকি দেয়া যেতে পারে। মোটকথা, আজ রাতের মধ্যেই বেরোতে হবে। সূর্যের আলোতে এখান থেকে পালানোর চিন্তা করাও বোকামি।

আইদাও জানে সেটা। তবু বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। কোথায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী আর কোথায় দুই জন নিরীহ মেয়েমানুষ। ভয়কে সঙ্গী করেই এক-পা দু-পা করে এগোতে লাগল তারা। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া দরজা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ঝুঁকি নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই তাদের সামনে।

মাঝে মাঝে দেয়ালে আলো ফেলছেন। নীচতলায় এক দিকের দেয়ালে থাইগ্লাস লাগানো জানালা। কী ভেবে তাওফীকা মোবাইলের লাইট অফ করে গ্লাস খুললেন। পাশেই গাছগাছালি ঘেরা। এই সন্ধ্যেতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাওফীকা আইদাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। প্রথমে আইদাকে বললেন বের হতে। জানালা গলে পালানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম আইদার। এমন হলে যা হয়, হাঁটুর দিকে ছড়ে গেল। পায়ের নীচে কী যেন লাগতেই 'উহ্' করে উঠল। তাওফীকাও যে খুব জানালা ডিঙিয়েছেন এমন না। তবুও আইদার তুলনায় আরেকটু সাবলীল তিনি। জানালা থেকে বাইরে বেরিয়ে বুঝলেন একটা ভুল করে ফেলেছেন। একবার নিজের দিকে, আরেকবার আইদার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাতে লাগলেন। গাছগাছড়ার ফাঁক গলে অন্ধকারে যতটুকু দেখা সম্ভব ইতিউতি তাকালেন। নাহ! আবারও ভেতরে যেতেই হবে!

আইদাকে এখানেই থাকার ইশারা করে জানালা গলে আবার ভেতরে ঢুকলেন। আইদা কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। যখন বেরিয়ে এলেন তার হাতে কিছু কাপড়। আইদার কাছে এতক্ষণে পরিষ্কার হলো সবকিছু। দুই জনেরই কাপড় সাদাটে। অন্ধকারে যা চোখে পড়তে পারে। দ্রুত পরনের কাপড়ের ওপর সেগুলো পরে নিল ওরা। এরপর পা বাড়ালো। অন্য সময় হলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হয়তো ওরা হেসে উঠত। একজনে পরেছে শার্ট আর লুঙ্গি, আরেকজনের পরনে গেঞ্জি আর চাদর। আঁধারে কী যে এনেছেন তা তাওফীকা নিজেই বুঝি টের পাননি।

দ্রুতপায়ে পথ চলছে দুইজনেই। যদিও জানে না কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু বাহ্যত এ পথটাকেই নিরাপদ মনে হচ্ছে। সামনের রাস্তা এবং পেছনের রাস্তা দুটোতেই বিপদের আশঙ্কা অনেকাংশে। সে তুলনায় জানালা দিয়ে বের হওয়াকেই যৌক্তিক মনে হলো। বেশ কিছুটা এগোনোর পর সামনে থেকে খসখস আওয়াজ পেয়ে জমে গেলেন তারা দুজনেই। তবে কি তীরে এসে তরী ডুবল!! খসখস আওয়াজটা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে আর তারা ভয়ে জমে যাচ্ছেন। আইদা তাওফীকার হাত খামচে ধরল। আওয়াজটা এখন একেবারেই সামনে। গাছের ফোকর থেকে মাথা বের করল এক খেঁকশিয়াল। হা হা করে স্বস্তির হাসি হেসে উঠতে গিয়েও সামলে নিল আইদা। তাওফীকাও মুচকি হাসলেন। আবার সেই এগোনো। দুরু-দুরু পথচলা। প্রায় মিনিট বিশেক হাঁটার পর দেখলেন জংলা শেষ। ওপারেই খেতের আইল। হাঁফ ছাড়লেন দুজনেই। মনে হলো মৃত্যুপুরী থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

আবার সে পথচলা। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ও দ্রুত পায়ে পথ চলছে তারা। বিপদের হাতছানি এখনো কাটেনি। অন্ধকার হলেও দুটো মানবছায়ার ছুটন্ত অবয়ব ফুটে ওঠে দূর থেকেই। এখন আরও খোলা জায়গা। দুজন দুজনের হাত ধরে ছুটছেন। মোটামুটি আধঘণ্টা এভাবে ছোটার পর ভেসে উঠল 'মধুমঞ্জুরীর' দরজা। এ দরজা দেখে জীবনে হয়তো এত খুশি হননি তাওফীকা যতটা এই এখন হলেন! নিঃশব্দে দুজনে ভেতরে প্রবেশ করে দরজার ছিটকিনি ভালোমতো এঁটে দিলেন।

পুরোনো হলেও বেশ মজবুত এ দরজা জোর করে খুলতে গেলে ন্যূনতম আধঘণ্টা সময় লাগবে। প্রয়োজনে হয়তো এরই মাঝে কোনো সুযোগ বা বাইরের সাহায্য

তারা পেয়ে যাবেন। যদিও বিপদের আশঙ্কা করছেন না তারা। তবু সাবধানতার মার নেই।

–ওফ!

আওয়াজ আইদার মুখ থেকেই প্রথম বের হলো। ধপ করে মেঝেতেই বসে পড়ল। হাসলেন তাওফীকা। হাসিটা পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বোঝাই গেল তিনিও স্বস্তি পেয়েছেন.

–ভালো এক অ্যাডভেঞ্চার গেল, কী বলো?

মুখ বাঁকাতে গিয়েও সামলে নিল আইদা। অমন অ্যাডভেঞ্চার ও বাপের জনমে করেনি!

–রাতে কী খাওয়া হবে, ম্যাম?

তাওফীকার পেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল।

–বাজারের প্যাকটা আনো দেখি।

প্যাকের ভেতরে আছে মিষ্টিকুমড়ো, গাজর, আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি বেশ কিছু সবজির সাথে আনা হয়েছে শিং মাছ আর চিংড়ি মাছ। চিংড়ি দিয়ে মিষ্টিকুমড়ো আর শিঙের ঝোলের কথা ভেবে জিভে জল চলে এল তাওফীকার। সাথে বাসমতি চালের ভাত। আহ্!

নড়েচড়ে উঠলেন তিনি। কিচেনে গিয়ে দেখলেন গ্যাসের অবস্থা খারাপ। তারা অবশ্য অমনই ভেবেছিলেন। তাই তারা সিলিন্ডার নিয়ে এসেছেন। ভাত চড়িয়ে দিয়ে আইদাকে চিংড়ি ধুতে পাঠালেন। এরপর নিজেই শিং কাটতে বসলেন। অকর্মা তিতিন এখন কর্মঠ তাওফীকা। এ রান্নাবান্নার কাজগুলো তিনি শিখেছেন সেই বস্তিতে। ছোট্টবেলার সুখের নীড়ে।

সেদিন সাইফুল তিতিনকে নিয়েই ফিরেছিল। ওস্তাদ আসে রাতের খাবারের সময়। দরজার তালা খোলার আওয়াজে সব চুপ। সতেরো জনের সতেরো জনই নীরব।

–কিরে! এত চিল্লাচিল্লি কিসের? কেউ উত্তর দিল না। কেউ কেউ আড়চোখে তিতিনের দিকে তাকাল।

–আজকের ট্যাকা দে!

পবন এগিয়ে গেল। নীরবে খুচরো টাকার থলেটা ধরিয়ে দিল। খুচরো হলেও এখানে প্রায় হাজার দুয়েক টাকা আছে। ওদের আজকের উপার্জন।

–কোনোহানে লুকায়া রাখস নাই তো?

–না, ওস্তাদ!

সমস্বরের উত্তরে সন্তুষ্ট হলো প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটি। জানে, তারা আসলেই লুকিয়ে রাখেনি। একবার একজন ধরা পড়েছিল, তাকে এখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর আগে প্রায় আধাদিন তাকে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। নাক দিয়ে পড়তে থাকা রক্ত বাকিদের এই দুঃসাহস থেকে বিরত রেখেছে।

–এই ছেমড়ি আবার কইত্তে আইলো?

তিতিনের দিকে চোখ পড়তেই বিশাল গোঁফের নীচ থেকে গুড়গুড় আওয়াজ এল। সবাই চুপ। সাইফুল গুটিগুটি এগিয়ে গেল।

–ইয়ে, ওস্তাদ...।

–ভাংভুং রাইখা কী কবি সোজা ক!

–কইতাছিলাম, মাইয়াডা রাস্তায় পইড়া ছিল...।

–আমি কি এইহানে লঙ্গরখানা খুলছি?

–ও আমাগো মতো কাম করব, ওস্তাদ!

–ওই ছেমড়ি, এইদিকে আয়!

শুকনো মুখে এগুলো তিতিন। যেন এর ওপর ওর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। এক অর্থে তো তা-ই!

–কী কাম পারোস তুই?

ও তো কোনো কাজ পারে না! খালি পারে আঁকতে। সে কথা এই গোঁফওয়ালার গোঁফ ভেদ করে মগজে ঢুকবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই চুপই রইল।

–ও! তোর বাড়ি কই?

–ওই ওদিকে!

কোন দিক দেখালো তা বোধকরি তিতিনও জানে না!

–চালাক ছেমড়ি! জায়গার নাম কবি না! বাপের নাম কী?

–জাহাঙ্গীর।

–পালাইছস? চুপ রইল তিতিন।

–পুলিস কেইস নাই তো?

কাষ্ঠ হেসে মাথা ঝাঁকাল তিতিন।

–সাইফুল, কালকা থিকা তোর লগে নিয়া কাগজ টোকাবি।

বলে বেরিয়ে গেল ওস্তাদ। সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিতিনের ওপর।

–এই, তোর গল্প কইবি আমগোরে?

–গল্প? কিসের গল্প?

–পালাইলি ক্যান?

তিতিন কথা হারিয়ে ফেলল। কী বলবে ওদের! ওর গল্প যে লুকিয়ে থাকার!

–ওই যাহ! আজকা আইছে মাইয়াডা, তোরা ওরে জ্বালাইস না।

সাইফুলের বাধায় মুখ বাঁকাল কেউ কেউ, 'এএএএএহ! আইছে! ভাব বাইড়া গেছে দেহা যায়!'

সাইফুল কিছু বলল না। তার ভাব বাড়বেই–বা না কেন? কী সুন্দর মায়া মায়া চেহারার একটা মেয়েকে ও খুঁজে পেয়েছে। চলা–ফেরা, কথা–বার্তায়ও সবার থেকে আলাদা। তিতিনের সঙ্গে সুবিধে করতে না পেরে ওরা এখন তিতিনের ব্যাগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিতিন দেখল, কেলেঙ্কারি ঘটল বলে! একরকম কেড়ে নিল ও ব্যাগটা। ওর পুরো জীবন!

–এই! ব্যাগ খুলবে তোমরা? এসো, আমি দেখাচ্ছি।

মেয়ের ভাব–ভঙ্গিতে পিত্তি জ্বলে গেলেও ব্যাগের গুপ্তধন দেখার লোভে সবাই সহ্য করল। একে একে সব বের করল তিতিন। ওর কিছু আর্ট, পরনের এক সেট আধছেঁড়া কাপড়, জলরং, তুলি, পেন্সিল আর একটা আংটি। দুইটা সাদা পাথরের খুবই সাধারণ আংটি। কেউ লক্ষ করল না, খুবই যতনে ও ব্যাগের একটা ছোট্ট পকেট খোলেনি, এড়িয়ে গেছে। ওতে আছে একটা নীল তোয়ালে!

–এগুলা সব তুই আঁকছস?

মাথা নাড়ে তিতিন। কেউ বিশ্বাস করে চোখ ছানাবড়া করে, কেউ অবিশ্বাসে

ভেঙচি কাটে। চুরির মালরে নিজের কইয়া চালাইয়া দিল ছেমড়ি—এমন একটা ভাব নিয়ে তারা সরে গেল। সেদিনের মতো সবাই ক্ষান্ত দিল। ওস্তাদ খাবার দিয়ে গেছে। যার যার প্লেট নিয়ে খেতে বসল। তিতিন সাইফুলের সাথে খেলো। ওস্তাদ কাল মনে হয় প্লেট নিয়ে আসবে।

–ওই, তুই পালাইছিলি ক্যান?

পরদিন একসাথে বেরিয়ে সাইফুল জানতে চাইল। ওর কাছে তো চুপ থাকা যাবে না!

–আমার মা মারা যাওয়ার পর আমার বাবা আমাকে দেখতে পারতেন না। কষ্ট লাগত খুব, পালিয়েছি!

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সাইফুল।

–ওই বাড়িত গেছিলি ক্যান? তিতিন চুপ করে রইল। ও আজকে যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ওর স্বপ্নটা যে প্রায় অবাস্তব! সেটার কথা কী করে বলে সাইফুলকে!

–চুপ কইরা আছস ক্যান? কবি না? আমাগোরে না কইলে এখন কইবি কারে?

সাইফুলের শেষ কথাটা যেন তিতিনকে নাড়া দিয়ে গেল। চোখ ছলছল করে উঠল ওর।

–ওই বাড়িতে একটা আর্ট প্রতিযোগিতা হবে। শিশু–কিশোরদের। নানা পুরস্কারের ব্যবস্থাও আছে। ভাবছিলাম...।

–ওগুলা সত্যিই তুই আঁকছস?

সাইফুলও ওকে বিশ্বাস করেনি! যাহ!

–আমারে কি তোর চোর মনে হয়?

‘ইয়ে, না...’, ধরা পড়ে গেল যেন সাইফুল, ‘বুঝসই তো, বাড়ি থিকা পালাইলে মাইনষে কতকিছু করে!’

–ওগুলো আমারই আঁকা! তিতিনের কণ্ঠে খেদ।

–তাইলে নাম দেস নাই ক্যান? তিতিন চুপ হয়ে গেল। সাইফুলকে বলবেই না!

–রাগ করছস? আমি কি উলটাপালটা ভাবছি, ক? পুলাপাইন এমন করে না? তিতিন বুঝেও বোঝে না।

–আইচ্ছা রে বাপ! ক্ষ্যামা দে! এবলা ক! নাম দেস নাই ক্যান?

–ট্যাকা লাগব। আস্তে করে বলে তিতিন।

–কত?

–তিন হাজার। এইবার বুঝল সাইফুল।

–ট্যাকা কবের মইধ্যে দিতে হইব?

–তা জেনে কী করবি?

–আরে! কস না! মৃদু ঝাড়ি খেয়ে কাঁধের ব্যাগ খুলে তিতিন পোস্টারটা বের করল। আরও ২৬ দিন আছে।

–আমার কাছে চাইশ শ ট্যাকা আছে। এই কয়দিনে বাকি ট্যাকা জোগাড় করতে হইব।

–কীভাবে?

–হেইডা জানি না!

–তুই আমার জন্য চিন্তা করছিস কেন?

–চিন্তা করলাম কই? তোর ট্যাকা লাগব, দিতাছি। তোর নিতে সমস্যা?

না, তিতিনের সমস্যা নেই। অন্যের দয়ায় চলে চলে নিজের মধ্যেও ভিখিরি একটা ভাব চলে এসেছে। ভিখিরিদের তো মানুষ করুণা করে দেয়, সাইফুল নিশ্চয়ই ওকে করুণা করবে না! বেশ কিছুক্ষণ নীরবে চলল ওরা। সাইফুল কী যেন ভাবছে!

–আচ্ছা, শোন্!

–হুম, বল্!

–আমরা কই যাই, কী করি কাউরে কবি না। কেউ জিগাইলে কবি এই গলিত্তে ওই গলি কাগজ টোকাই। আমাগো লিগা অন্য কোনো কাম করন নিষেধ আছে। জানলে রক্ষা নাই!

–কী করবি তুই? সাইফুল উত্তর দিল না। একটা রিকশা ডাকল।

–তুই একটা কাম করতে পারবি?

–কী?

–রাস্তায় ঘুইরা ঘুইরা ফুল বেচতে পারবি?

মাথা কাত করল তিতিন।

শাহবাগে ফুলের দোকানের সামনে রিকশা থামাল সাইফুল। ট্যাঁক থেকে ভাড়া বের করে দিল। অনেকগুলো দোকান ঘুরে ঘুরে দুই শ টাকার ফুল কিনল। এরপর একটা বাসে উঠল।

–তোর মায় ক্যাম্নে মরছে রে?

–মানুষ আবার ক্যাম্নে মরে?

–একেকজন একেক রকম ভাবে মরে। আমার মায় বাপের মাইর খাইতে খাইতে মরছে।

'আমার মা এমনি মরে গেছে,' এবার তিতিন প্রশ্ন করল, 'তুই পালালি কেন?'

–বাপে আমারে দিয়া কাম করাইতো আর নেশা করত। আমারে ধইরা মাইর-ধইরও করত! এম্নে কি থাকন যায়! এইখানে তো মাইরটা খাওন লাগে না!

–তুই টাকা জমাচ্ছিস কীভাবে? জানতে পারলে তো...।

–কীভাবে জানবে? আমি কাউকে বলিনি। টাকা সাথেও রাখি না।

–তাইলে?

গোপন কথা! হুঁ!—এই ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সাইফুল। মুখ বাঁকাল তিতিন। ততক্ষণে বাস এক জায়গায় থেমেছে। সাইফুলের সাথে তিতিনও নেমে গেল।

–এই জায়গাটা ভালোমতো চিইনা রাখ্! মগবাজার ওয়াল্লেস কয় এইটারে। আসরের সময় ঠিক এইখানে থাকবি। এই রোড আর ওই দুই রোড ছাইড়া কুনুহানে যাবি না!

মাথা নাড়ে তিতিন। আচমকা সাইফুল ওর মুখে কী যেন মেখে দেয়! নিজের মুখেও মাখে। একটা কাপড় বের করে দিয়ে বলে, 'নে, হালকা কইরা মুখটা মোছ! হতভম্ব তিতিন মুছে নেয়। তিতিনের ফর্সা মুখটা এখন কালো শ্যামলা হয়ে গেছে। কালিটুকু মুছে নেয়ায় কালি বোঝা যায় না। মনে হয়, ওর মুখটাই বুঝি কালচে। এবার কোমর থেকে একটা কালো রঙা আধময়লা কাপড়ের টুকরা বের করে সাইফুল।

সেটা দিয়ে ওকে জড়িয়ে দেয়।

–এইডা সরাবি না। তোর কাপড় য্যান দেখা না যায়। ওস্তাদ বা আমগো কেউ এদিকে আইবো না। তাও খিয়াল কইরা থাকন ভালা।

তিতিন এবার সবটা বোঝে। সাইফুল আরেক বাসে উঠে কই যেন যায়, ও জানে না।

তিতিনের জীবনে সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায় শুরু হলো। সাইফুলকে পারব বললেও সে বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে কী করবে। একজন লোকের সামনে গিয়ে বলবে, 'ভাইয়া, ফুল নেবেন? নাকি এমনিই ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? কেউ যদি ঝাড়ি দেয়? ওই... ওই লোকটার মতো ধাক্কা দেয়? ভয় পায় তিতিন। সাইফুল প্রথম দিনটা ওর সাথে থাকত! সাইফুল গেল কোথায়? ওরা যদি ধরা পড়ে যায়? ভাবতে ভাবতে তিতিন ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে।

এক জায়গায় একজোড়া ছেলে–মেয়ে বসা। দেখেই বোঝা যায়, প্রেমিক–প্রেমিকা হবে। তিতিন ওদের সামনে দিয়ে দুইবার অযথাই ঘুরল, কিন্তু তারা ডাকল না। তৃতীয়বার একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল,

–ভাই..।

শুদ্ধ ভাষা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল তিতিন। ফুলবিক্রেতা এক পিচ্চি মেয়ে নিশ্চয়ই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে না!

–ভাইজান, ফুল লইবেন? যতটা সম্ভব সাইফুলদের মতো করে বলল ও।

–ওয়াও! গোলাপটা কী কিউট! বলে মেয়েটি ওর হাতে থাকা সবচেয়ে বড় গোলাপটায় হাত দিল।

–তোমার পছন্দ হয়েছে জানু?

–হুমমম! অন্নেএএক' আহ্লাদী স্বর মেয়েটির।

–দাম কত রে?

–বিশ ট্যাকা। সাইফুল দাম বলে দিয়ে গেছে।

–আর এই মালাটা?

–তিরিশ।

–দুইটা চল্লিশ ট্যাকায় দে!

–দেওন যাইবো না স্যার!

–এমন করছ কেন মেয়ে? দিয়ে দাও না! আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

তিতিন আর কিছু না বলে নীরবে গোলাপ আর মালা বাড়িয়ে ধরল। কিছুটা সামনে এগিয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখল রানি গোলাপী আর সাদার মায়ামাখা ফুলখানি মেয়েটির খোঁপার শোভাবর্ধন করছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগে ওর। একটা ফুল নিজের খোঁপায়ও গুঁজতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু, কিন্তু ইচ্ছেরাও যে বিত্তশালীদের পক্ষেই কথা কয়!

কিছুক্ষণ ঘোরলাগা মানুষের মতো কালোর মাঝে ফুটন্ত গোলাপটির দিকে তাকিয়ে থাকে, এরপর চোখ ফিরিয়ে নেয়। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ময়লা কাপড় পরা মেয়েদের এসব মুগ্ধতা থাকতে নেই! এরা ফুল বিক্রির টাকা গুনবে, সবটুকু মহাজনের কাছে তুলে দিয়ে বিনিময়ে কাঁচা মরিচ আর সরিষার তেল মেখে দু–মুঠো ভাত খেতে পাবে; ফুলের সৌন্দর্য দেখার অধিকার তাদের নেই!

আসরের ঠিক পরপরই ফেরে সাইফুল। তিতিন সেখানেই দাঁড়িয়ে ওর অপেক্ষায়। দুপুরের একটু পরেই ফুল শেষ, এতক্ষণ এদিক–ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। খায়ওনি কিছু। সাইফুল এগিয়ে আসতেই হাতের মুঠো এগিয়ে দিল ও। পাঁচ শ পনেরো টাকা আছে তাতে। সাইফুল ওর লুঙ্গির ট্যাঁকে টাকা রাখে। রাখার সময় দেখা যায় তাতেও কিছু টাকা আছে। কত, তিতিন জানে না।

–ম্যাম! ভাত হয়ে গেছে। তড়িঘড়ি করে স্মৃতির ঝাঁপি বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন তাওফীকা। মানুষ নাকি বুড়ো হলে স্মৃতিকাতুরে হয়ে পড়ে। তবে কি তিনি বুড়িয়ে গেছেন? আনমনেই স্মিত হাসলেন। পঁয়ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে আর তিনি ভাবছেন বুড়িয়ে গেছেন কি না! এখন তো কেবল আল্লাহর ডাকের অপেক্ষা! যখন তখন...।

–আইদা, আগামীকাল ঝুমুরদের বাড়ি যাব!

–লোকগুলো যদি পিছু নেয়?

–দিনের আলোয় কিছু করবে না!

আইদা মানতে পারল না। সূর্যের আলো কখনো পশুকে মানুষ বানিয়ে দেয় না। পশু সব সময়ই পশু। হ্যাঁ! কোনো কোনো পশু আলোর ছিটে সইতে না পেরে ধারালো নখর লুকিয়ে রাখে, কিন্তু এদের সে রকম মনে হচ্ছে না। তবু কিছু বলল না।

তাওফীকা রাঁধছেন আর গুনগুন করছেন। আইদা বিস্মিত হচ্ছে না আর। ম্যাম কেন এ বাড়িতেই উঠলেন আর কেনই–বা এমন অদ্ভুত কিছু আচরণ করছেন, তার কিছুই বুঝে না উঠতে না পেরে আইদা অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তারা তো চাইলেই ভালো একটা হোটেলে উঠতে পারত। তাহলে এইসব রান্নাবান্নার ঝামেলাও থাকত না।

–আইদা, গুনগুন থামিয়ে ডাকলেন তাওফীকা।

–ইয়েস ম্যাম!

–ধুর! এই ম্যাম ম্যাম শুনতে সব সময় ভালো লাগে না। বাড়িতে ম্যাম বলবে না!

–ইয়েস, ম্যা....। ম্যাম না বললে কী বলবে? বুঝে উঠতে না পেরে থেমে গেল আইদা।

–আপু বলবে!

–আপু...।

–হ্যাঁ, কেন? সমস্যা? আমি তোমার থেকে বছর দশেক বড় হব। এই ব্যবধানে তো খালাম্মা বলা যায় না। তবে তুমি চাইলে খালাম্মাও বলতে পার। বাট, নট ম্যাম!

–ইয়ে, জি...।

–দোতলায় যেতে পারবে একা?

–কেন পারব না? উজ্জ্বল লাইটে সাহস বেড়ে গেছে আইদার।

–ডানদিকের দ্বিতীয় রুমটায় একটা বড় টেপ আছে। কিছু ক্যাসেটও আছে। নিয়ে এসো তো, দেখব ওগুলো ভালো কি না!

–জি! আইদা হাঁটতে শুরু করল। পেছন থেকে তাওফীকা বললেন, 'সাবধানে

যেও। তেলাপোকা, ইঁদুরের বাসা হয়ে গেছে বোধহয় এতদিনে। আর হ্যাঁ! বাম দিকের ঘর দুটোয় যেয়ো না।'

আইদা বিস্মিত। ম্যাম ওপরে গেলেন কখন! ঠোঁট উলটে ও ওর কাজে চলল।

দোতলায় উঠে আলো ফেলতেই আইদার পা আটকে এল। এত পুরোনো এক বাড়িতে এহেন বিলাসিতা! কিছু কাঠের ছায়া, দেখেই বোঝা যায় দক্ষ হাতের নিখুঁত কারুকাজ। দেয়ালজুড়ে আছে নানা রকমের নয়নজুড়ানো পেইন্টিং। একটাতে এক ছোট শিশু নদীর তীরে মায়ের কোল থেকে নৌকাবাইচ দেখছে। ওর নিজের ছেলেটার কথা মনে হলো। মনে পড়ল বাড়িতে রেখে আসা বৃদ্ধা মায়ের কথা। তবুও ভাবে, এখন খুব ভালো আছে! খুব ভালো! নিজেকে ভালো রাখার পাশাপাশি এখন ওরই মতো নির্যাতিত বোনদের পাশে দাঁড়াতে পারছে। কয়জন পারে এমন! তবু কেমন যেন এক শূন্যতা...।

শ্বাস ছেড়ে ডানদিকের দ্বিতীয় রুমের দরজা খুলল। কী দেখবে বলে ভেবেছিল, তা সে-ই জানে! কিন্তু নিরাশ যে হয়েছে তা নিশ্চিত! পুরোনো-সব জিনিস গাদা মারা। এর মাঝ থেকে টেপ বের করা আর খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজা একই কথা। তবু ম্যামের আদেশ! কী আর করা! এক এক করে জিনিস সরিয়ে খুঁজতে শুরু করল। প্রথমেই বের হলো একটা বীণা, ভাঙা। এরপর বের হলো বেশ বড় এক ওয়াকার। ছোট্ট বাচ্চাদের কিছু খেলনা। এ বাড়ির বাসিন্দারা খুব সৌখিন ছিল বোঝা যায়। আইদার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। বেশিক্ষণ খুঁজতে হয়নি, ঢাউস আকৃতির একটা টেপ উঠে এল ওর হাতে। ক্যাসেট কোথায় পায় এখন? আশেপাশে নজর বুলাতেই দেখল সাইডে একটা আধভাঙা সেলফ। সেটারই এক তাকে হাজারো মাকড়সার জাল পেঁচিয়ে ক্যাসেটগুলো জমে আছে একরকম। হাঁচড়েপাঁচড়ে ওগুলো থেকেই কয়েকটা বের করে নীচে নেমে এল আইদা।

এসে দেখে রান্না শেষ। ম্যাম খাবারদাবার বক্সে ভরছেন। এমা! খাবার আর বক্সে কেন! ওকে দেখে হাসলেন তাওফীকা।

–আইদা, আমাকে কি পাগল ভাবছ?

–ইয়ে, না, ম্যাম! কেন ভাবব!

–আবার ম্যাম!

–স্যরি, আপু!

–তাহলে আরেকটা কাজ করতেই পারি আমি না কি বলো?

–কী? শঙ্কিত হলো আইদা। মাঝবয়সেই এই মহিলাকে ভীমরতিতে পায়নি তো!

–চলো, ছাদে যাই। লাইট নিভিয়ে চাঁদের আলোয় আজ ভোজন হবে।

–অন্ধকারে! কী বলেন আপু!

–চাঁদের আলোকে তুমি আঁধার বলছ আইদা? জিভ কাটল আইদা।

ক'দিন আগেও সে নিজেই চাঁদের আলোয় কত কী করত! রান্না থেকে শুরু করে মাটি কাটাও! সুসময় এলে মানুষ আসলেই দুঃসময়কে ভুলে যায়! নিজেকে দিয়েই তা বেশ টের পেল ও। দুজনে সব গুছিয়ে সিঁড়ির দিকে চলল।

ঝকঝকে স্বচ্ছ আকাশ। তারার আলোয় ঝলমল করছে, মধ্যমণি হয়ে আছে পূর্ণচন্দ্র। এতই উজ্জ্বল মনে হচ্ছে এই বুঝি মুখখানা চাঁদের অন্তরে ভেসে উঠল। সৌখিন কিশোরী যদি ভাবে, আসমানেও তার জন্যে একখানি আয়না রাখা আছে, তবে তাকে দোষ দেয়া যাবে না! এই আলোমাখা রাতগুলো মায়াবী হয়। আপনজনের মাথার চুলের ঘ্রাণ শুঁকে বলতে ইচ্ছে হয়,

'ওগো মায়াবিনী! কী মায়ায় বাঁধলে গো আমায়

এক পৃথিবী আলো হাতে আমি যে তোমারই অপেক্ষায়...।

এই জীবন্ত রাতগুলো মোহময় হয়। সবার চেহারাতেই জ্বলজ্বল করে এক অদ্ভুত শুভ্রতা। মুগ্ধ করে দেয়ার মতো। আইদাও মুগ্ধ চোখে তাই চেয়ে আছে তাওফীকা হাসানের দিকে আর ভাবছে, আমাকেও কি ম্যামের মতো লাগছে? নাকি জীবনের গ্লানি মুখের আলো নিভিয়ে দিয়েছে? আইদা জানে না, জোৎস্না বড় উদার হয়। সে যেমন ছুঁয়ে যায় পবিত্র অন্তরকে, তেমনি ফেলে দেয় না কালিমাখা মুখখানাকে। সে সবার তরে! কারণ, রবের অনুগ্রহ তো সকলের জন্যই!

পাটি বিছিয়ে সবকিছু গুছিয়ে বসল ওরা। প্রচণ্ড ক্ষুধা দুই জনেরই। ফর্মালিটির ধারকাছ দিয়ে গেল না কেউ। পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্লজ্জ বোধহয় ক্ষুধা। একটা পর্যায় পর্যন্ত সয়ে নেয়া গেলেও অসহনীয় ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা নেই কারোর। পৃথিবীতে এই যে খুনখারাবী, সন্ত্রাস কিংবা শরণার্থী এর সিংহভাগ জুড়ে আছে

এই ক্ষুধা। তাই ফর্মালিটির ধারকাছ দিয়ে গেল না কেউ। শুধু যতটুকু সম্ভব 'ভদ্র' গোগ্রাসে 'খেতে' লাগল। নীরবে। ক্ষুধা কিছু থিতিয়ে এলে মুখ খুললেন তাওফীকা।

–আইদা! এভাবে খোলা আকাশের নীচে বসে খেয়েছ কখনো?

ঠোঁট উলটে 'কত খেয়েছি! বলতে গিয়েও থমকে গেল আইদা। 'কত খেয়েছে' বটে, কিন্তু সে দিনগুলো আর আজকের দিনে কত বিস্তর তফাত৷ আজকের এই পরিবেশ যেন স্বয়ং আল্লাহর দেয়া এক বিশেষ অনুগ্রহ। কত দূরত্ব সেই দিন আর এই দিন!

–খেয়েছি ম্যাম, তবে এভাবে নয়।

তাওফীকা বিস্তারিত জানতে চাইলেন না। বুঝে নিয়েছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আঁচলের সদস্যাদের তিনি সবটা দিতে পেরেছেন, কিন্তু একটা জিনিস দিতে পারেননি, পারবেনও না। অতীতটুকু ভুলিয়ে দিতে...। পারেননি তাদের অন্তরের শূন্যতাটুকু পূরণ করতে। কেবল দেখাতে পেরেছেন নতুন কিছু স্বপ্ন। কখনো যদি এই স্বপ্নের হাত ধরে শূন্যতাটুকু পূরণ হয়ে যায় কিংবা অতীতকে তাদের বড় অবাস্তব মনে হয়, তবেই সার্থকতা!

–ম্যাম, ঝুমুরকে নিয়ে যাওয়ার সময় লোকগুলো কোনো ঝামেলা করবেই। কী করবেন, ভেবেছেন কিছু?

–থানায় মামলা করে কাজ হবে কিছু বলে মনে হচ্ছে না। গতকালের লোক দুজন কি পুলিসের না গোয়েন্দা বিভাগের, তাদের পাওয়া যাবে কোথায় জানতে পারলে ভালো হতো।

–হুম। তবে তারা কি আমাদের এ কাজে হেল্প করত?

গম্ভীর হয়ে গেল আইদা।

আঁচলের সদস্যাদের ছদ্মনামে সমাজে বাস করার সুযোগ দিয়েছেন তিনি। কোনো পত্রিকায় তাদের ছবি দেয়া নিষেধ। সব মিলে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয় তাদের। তাদের স্বার্থেই। ছদ্মপরিচয়কে পুঁজি করে একবার মামলাও করেছিল এক লোক৷ একটি মেয়েকে আশ্রয় দেয়ায় বিদ্বেষবশত তাকে দিয়ে মামলাটি করিয়েছিল আরেকজন। মামলাটি ছিল একটি চুরির মামলা। সে মামলার রায়ের কয়েকদিন আগেই তাওফীকা সংবাদ-সম্মেলন করে তুলে ধরেছিলেন আঁচলের কার্যক্রম এবং

মিথ্যা মামলার বিষয়টিও। তখন থেকেই আঁচল মিডিয়ার চোখে পড়ে যায়, আঁচল নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। আঁচলের কার্যক্রম জেনে সবাই মুগ্ধ হয়। আঁচলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলাটি নিয়ে কয়েকটি পত্রিকা তখন লেখালেখিও করেছে বেশ। ফলে শুনানির আগেই বিষয়টি নিয়ে বারে আলোচনা হয়, আলোচনা হয় বিচারকদের মাঝেও। ফলে প্রথম শুনানিতেই জজ কেসটিকে ভ্রান্ত আর আইনকে বিপথে নেয়ার প্রচেষ্টার অংশ আখ্যা দিয়ে খারিজ করে দেয়; বরং মামলাকারীকে গুনতে হয়েছিল জরিমানা।

ভাবনার অতলে সাঁতার কাটতে কাটতে দুজনেই খাওয়া শেষ করলেন। সবকিছু গুছানো হয়ে গেলে তাওফীকা বললেন, 'একটা গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব...।'

–ওহ! আপু! শিওর প্লিজ!

তাওফীকা আসলে ওর অনুরোধ শুনতে বলেননি কথাটা। অস্ফুটে বেরিয়ে এসেছিল। মায়াময় রাতের নিস্তব্ধতায় যেন কোনো মায়াবিনী গেয়ে উঠল, 'এই খুঁটিহীন নীলাকাশ ভুবন মাঝে, তুমি কুদরতী ইশারায় গড়েছ...' সুরের মাঝে যেন ভেসে আসতে লাগল সেই দিনগুলো। সাইফুল, পবন আর মীরাদের মুখগুলো...!

ছোট্ট ঘরখানি তিতিনের কাছে ছোট্ট এক সংসারের মতো ছিল। দিনে কাজ আর সন্ধ্যের পর ওদের রাজ্য। দুষ্টুমি, দাপাদাপি আর ঠাট্টা, তামাশায় জীবন্ত হয়ে উঠত একেকটি রাত। বাস্তবতা আর নির্মমতার শিকার এ ফুলগুলো এরই মাঝে বেঁচে থাকত। বেঁচে থাকার সামান খুঁজে পেত।

তাদেরও এক সমাজ আছে, সভ্য সমাজের কাছে যা অচেনা। আছে হাসি–কান্না, মান–অভিমানের পসরা। আছে মায়ার বন্ধন, বিদায়ের ক্রন্দন। হিংসা–বিদ্বেষের জালও কম বিস্তৃত না। হয়তো তাদের পরিধি ছোট, ক্ষমতা অল্প। এই পরিধি আর ক্ষমতার তারতম্যের জন্য তথাকথিত 'সুশীল সমাজ' কি দায়ী নয়? কে জানে, এই বিভেদের দেয়াল না থাকলে তাদেরই কেউ হয়তো হতে পারত সমাজ গড়ার কারিগর।

এসব সীমাবদ্ধতা ছোট্ট গলির ছোট্ট ঘরটার অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিত্তবানদের করুণার দৃষ্টি আর মুখোশধারী মানুষদের তাচ্ছিল্যেই তারা অভ্যস্ত;

বরং যেন নির্লিপ্ত। এই নির্লিপ্ততা তাদের বাঁচার উৎসাহ জিইয়ে রাখে।

কোনো কোনো দিন তারা 'বনভাত' খায়। তিন মাস অন্তর একদিন তারা ছুটি পায়। তাদের সেদিন কাজ করতে হয় না। মাঝে মাঝে ওস্তাদের কাছ থেকে বলে-কয়ে কিছু টাকা রাখে। মহাউৎসাহে তারা বাজারে যায়। কেউকেটা ভাব নিয়ে দরদাম করে। এ নিয়ে একরকম প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে তারা। কেউ পাঁচ টাকা কমাতে পারলেও বিশ্বজয়ের হাসি দিয়ে বাকিদের দিকে তাকায়। অন্যরা মুখ বাঁকায়। তাতে মিশে থাকে আনন্দমিশ্রিত ঈর্ষা।

এসবের মাঝেই চলছে সাইফুল আর তিতিনের যুদ্ধ। জীবন জয়ের যুদ্ধ। সাইফুল আর তিতিনের সে যুদ্ধ চলেছিল প্রতিযোগিতার একদিন আগ পর্যন্ত। সেদিন ফেরার কিছু আগে সাইফুল ওকে নিয়ে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসল। গাঁট খুলে হিসেব করতে বসল। মোট ২৬৫৭ টাকা আছে। আজকেই ফি জমা দেয়ার লাস্ট ডেইট। কী করবে ভেবে না পেয়ে আবারও ওই বিল্ডিংয়ের কাছে গেল।

–তুই আবার আইছস?

–আজকে ট্যাকা জমা দিতে আইছি চাচা।

দারোয়ান চাচা ভ্রুকুটি করেন,

–দেখি!

সাইফুল গাঁট থেকে টাকা বের করে। দারোয়ান চাচা হাতে নিয়ে গোনেন।

–এইখানে তো তিন হাজার নাই! তিতিনের মুখটা কালো হয়ে যায়। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখ দুটো ছলছল করে। সাইফুল বলে ওঠে, 'আমরা পোলাপান আর কত পামু, চাচা? বসের পাও ধইরা হইলেও ওর নাম দেয়ামু। লাগলে হের বাড়িত কামলা খাটুম। যাইতে দেন না চাচা!'

দারোয়ান চাচার চোখ দুটোও কেমন ছলছল করে উঠল।

–তোমরা একটু এইখানে খাড়াও। ভেতরে আইসো না কিন্তু। আমার চাকরি যাইবো। আমি আইতাছি...।

ঘাড় কাত করে ওরা দুজন। অল্প সময়েই ফেরেন চাচা। হাতে কিছু খুচরো টাকা।

–লও। আমার মাইয়াডার জ্যামিতি বক্স লাগব কইছিল, হের লিগা কিছু ভাঙ্গা আলগা করছিলাম, বাজারের লিগাও কিছু জমানি আছিল। তুমিও তো আমার মাইয়ার মতোই। এইবার ভিত্রে যাও।

ওদের কণ্ঠে স্বর ফুটল না। হঠাৎ তিতিনের কী হলো কে জানে, দারোয়ান চাচার পা ছুঁয়ে সালাম করল। চাচা কিছু বললেন না। তিনটি মনের অশ্রু যেন এক নদীর বাঁধভাঙা স্রোত।

একদিন পর। সাতসকালে পিচ্চিরা সব ঘুম থেকে উঠে দেখে, সাইফুল আর তিতিন নেই। এমনকি রুমে ওদের কিছুই নেই। দেয়ালে একটা কাগজে রং-পেন্সিলে কী যেন লেখা! পবন তরিকুলকে এগিয়ে দেয়,

–এই! পড়্-না কী লেখা!

তরিকুল স্কুলে দুয়েক ক্লাস পড়েছে। বানান করে একটু একটু পড়তে পারে। ভাঙা ভাঙা শব্দে শুরু করল, 'আজকে দুপুরে তিন রোড পর হিরন মিয়ার দোকানের গলিটায় লাল রঙের বাড়িটায় যেও সকলে। ভালো পোশাক পরে নিয়ো, নতুবা ঢুকতে দেয়া হবে না।

তরিকুলের পাঠ-যুদ্ধ শেষ হলে ওরা বিস্মিত চোখে একে অপরের দিকে তাকাল। ঠিক সে সময় তালা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। গম্ভীরমুখী তেওয়াজ মিয়া খাবার দিয়ে গেল। আর তালা লাগালো না। কারণ, খেয়েদেয়েই বাচ্চারা সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে।

–কিরে, ওরা কী করব মনে হয়?

পবনের স্বর গম্ভীর। ভয়ে বুক কাঁপছে ওর।

–যাই করুক, ওগো কপালে শনি আছে! সাইফুলডা আগে থিকাই আউলাঝাউলা, হেইদিনও ওরে দেখছি আমগো বাড়ির দেয়ালের জায়গাটা খুঁইড়া ট্যাকা বাইর করতে। আমি একলাই জানতাম বইলা ওরেও বুঝাই নাই। যদি জমাইতে পারে, জমাক। কিন্তু এখন আবার জুটছে ওই অকর্মা মাইয়াডা। ওর জীবনডারে শেষ কইরা ছাড়বো। ক্ষোভ ঝরে পড়ল সাইফুলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু শিপনের।

ওর কথা শুনে সবার চক্ষু চড়কগাছ! সাইফুল ট্যাকা জমাইছে! কত্ত বড় কথা!

–আমার কিন্তু যাইতে মন চাইতাছে! মিনমিন করে বলল সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য রানি।

–কী! ধমকে উঠল পবন।

–ভাই, একটা দিনই তো, কেডায় জানবো আমরা কেউ না কইলে? আবদুলও আবদার জানায়।

–যদি ওস্তাদ জানে কী অবস্থাডা হইবো তোরা বুঝস না? এই প্রশ্নে সবাই ভয় পায়। তবু যেতে চায়।

সবাই চুপচাপ। মুখে খাবার রোচে না। কিছু পর পবন বলে,

–আইচ্ছা, যাগো মন চায় যা। খবরদার! দেরি করবি না আর প্রতিদিনের হিসেবমতো ট্যাকা য্যান য্যামনেই হোক জোগাড় হয়।

সময়মতো দেখা গেল পবন নিজেই ফিটফাট ফুলবাবু হয়ে সবার আগে বের হচ্ছে। যাদের যাও একটু ভয় ছিল, তারাও সব দ্বিধা ঝেড়ে হই হই করে উঠল। হুট করেই ছোট্ট ঘরটা উৎসবে ভরে উঠল। ঠেলাঠেলি করে কাপড়-চোপড় পাল্টে সবার তুলে রাখা সব চেয়ে সুন্দর একটা পোশাক গায়ে পরে নিল। শিপনের একটা পাউডার ছিল, তা নিয়েই কাড়াকড়ি। এইটুকু জীবনে আনন্দের এত অভাব! এতটুকুতেই আজ ওদের ঈদ ঈদ লাগছে!

'চিত্র বিচিত্র' সংগঠন থেকে আয়োজিত 'চিত্রে আঁকি জীবন' শিরোনামে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে প্রচুর মানুষের ভিড়। বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক শিশু-কিশোরদের নিয়ে তাদের বাবা-মা ও কাছের মানুষেরা এসেছে।

তিতিনের সাথে এসেছে সাইফুল। ওর এক আপনজন। এই ক'টা দিনে ছোট্ট ওই রুমটাকে ও নিজের বাড়ি ভেবে বসেছিল তিতিন। মনে হতো ওরাই ওর আপনজন। সাইফুলের প্রতি ছিল অসীম কৃতজ্ঞতা। এখন সেখানে যুক্ত হয়েছে এক নির্ভরতা। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকা তিতিন জানে, জীবনে বেঁচে থাকতে এক ভরসার হাত খুব প্রয়োজন হয়। চাই সে হাত হোক বাবা-মায়ের, বন্ধুর কিংবা অন্য কারও! সে তা খুঁজে পেয়েছে সাইফুলের মাঝে।

দর্শকদের প্রথম সারিতে এক কোণে সাইফুল। তাকিয়ে আছে তিতিনের দিকে। পারবে তো ও? নীল ফ্রক পরা তিতিনের কোনো দিকে মনোযোগ নেই। কাপড়টা অন্যদের থেকে কমদামি হলেও সাইফুলের চোখে ওকেই রানি মনে হচ্ছে। ওর শেষ সম্বল দিয়ে কেনা জামাটা। আর আছে পঞ্চাশ টাকা। আজকে তিতিন প্রথম না হলে সব শেষ! ওই রুমে ফিরে যাওয়ার উপায় রাখেনি নিজেই। এক মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোও সম্ভব না। কী করবে তখন?

এতদিন তো ভাবেনি, এই শেষ সময়ে এসে ভাবনায় পড়ল ও। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারেনি তো? ঘামতে লাগল ও মৃদু মৃদু। দুশ্চিন্তায় না থাকলে ও দেখতে পেত, একেবারে পেছন থেকে একদল কিশোর-কিশোরী তিতিনকে লক্ষ্য করে হাত নেড়েই যাচ্ছে অনবরত। তিতিন মাথা নাড়লেই ভাবছে, এই বুঝি ওদের দিকে তাকাল! কিন্তু তিতিন আবার মাথা নোয়াতেই হতাশ মনে মাথা নাড়ছে।

সময় শেষ হয়ে এলে ঘণ্টাখানেকের বিরতি ঘোষণা করা হলো। বিচারকদের পর্যালোচনা হবে। তিতিন সাইফুলের কাছে গেল।

-কিরে! কেমন হইছে? তিতিন বিষণ্ন। মনমতো আঁকতে পারেনি ও। ওর ছবিতে আছে কিছু শিশু। ওদের কেউ ফুটপাথ থেকে কাগজ কুড়োচ্ছে, কেউ ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে। পাশেই এক বড়লোকের আহ্লাদী সন্তান চিপস শেষ করতে না পেরে ফেলে দিচ্ছে আর নাক চেপে ধরে ডাস্টবিনের পাশ থেকে সরে যাচ্ছে। দূর থেকে এক মমতাময়ী নারী তা দেখে চোখের অশ্রু ফেলছেন, তারও পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। ছবিটাতে মায়ের মুখখানি ও মনমতো আঁকতে পারেনি বলে মন খারাপ।

ওর কথা শুনে সাইফুলেরও মন খারাপ হয়ে গেল। ও তো এসব বোঝে না। তিতিন বলেছে ভালো হয়নি মানে ভালো হয়নি। ও কি বাইরে গিয়ে কাজে লেগে যাবে নাকি এখানেই অপেক্ষা করবে বুঝতে পারছে না। কী হবে শেষ পর্যন্ত!

ক্ষুধা লেগেছে, কিন্তু খাবার কিছু নেই। মুখেও রুচি নেই দুজনের কারওই। এক কোনায় সরে গেল ওরা। কোনো কথা নেই। মন খারাপ দুজনেরই। তিতিন অপরাধবোধে মাটিতে মিশে যাচ্ছে; সাইফুলের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল,

-সাইফুল, শিপনের ডাক।

ওরা এসেছে! ওদের দেখে এই দুশ্চিন্তায়ও হাসি ফুটল ওদের মুখে। ওরা ভেবেই নিয়েছিল, বাকিরা আসবে না।

-আমগোরে আগে কইলে কী হইতো? রাত জাইগা তিতিন যখন আঁকছে, আমরাও ওর লগে সজাগ থাকি নাই?!

-কষ্ট নিস না দোস্ত! বললে কোনো-না-কোনোভাবে ওস্তাদের কানে গেলে তোরাও বিপদে পড়তি।

–যদি তিতিন প্রথম না হয়, তহন কী করবি?

সাইফুল এর উত্তর জানে না। পবন সাহস দেয়, 'ওস্তাদ তো জানে না। রুমেই যাবি!'

সাইফুল কাষ্ঠ হাসে, সে পথ ও নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে।

–কিরে তিতিন, কথা কস না ক্যান? ভালো হয় নাই? মীরার প্রশ্ন। তিতিন মাথা নাড়ে,

–এর লিগা চিন্তা করস? চিন্তা কইরা কী হইবো ক! দ্যাখ, আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর!

ওরা হাসে। সান্ত্বনার হাসি।

ঘন্টাখানেক পর। প্রতিযোগীরা নিজ নিজ জায়গায় উদগ্রীব হয়ে আছে। কেউ কেউ হাসছে, আত্মবিশ্বাসী হাসি। পুরস্কৃত করা হবে মোট তিন জনকে। তাদের প্রত্যেককে প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। এ ছাড়াও পরবর্তী সাত জনকে দেয়া হবে সান্ত্বনা পুরস্কার।

তিতিন নীরস মুখে বসে আছে। উপস্থাপক দাঁড়ালেন। বিচারকদের পরিচয় আর স্তুতিপর্বের পর প্রধান আয়োজককে স্বাগত জানালেন। তিনি সহাস্য বদনে বললেন, সবার চিত্রই তার ভালো লেগেছে। এ দেশের শিশু–কিশোররা যে এত মেধাবী, তা তার জানা ছিল না! ইত্যাদি ইত্যাদি বক্তব্যের পর এল বিজয়ী ঘোষণার পালা। সবাই কান খাড়া করল। সাইফুল হতাশ হলেও ক্ষীণ আশা তো টিমটিমিয়ে জ্বলছেই!

প্রথমে ঘোষিত হবে তৃতীয় স্থান অধিকারীর নাম। সে পাবে নগদ পনেরো হাজার টাকা এবং প্রদর্শনীর সুযোগ। নীরব কেন্দ্রটিতে যেন গমগম করে উঠল, 'তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে রাইহান—কুষ্টিয়ার হিলস্টোন ক্যাডেট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী।'

সাইফুল পুরো চুপসে গেল। হলে ওই তৃতীয়ই হতো তিতিন। বাচ্চারাও পুরো নীরব হয়ে গেল। দ্বিতীয় স্থানে কোনো এক সন্দ্বীপ আর প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাওফীকা নামে এক মেয়ে। সাইফুল হাতের ইশারায় তিতিনকে প্রতিযোগীর আসন ছেড়ে উঠে আসতে বলল। তিতিন উঠল না, বসেই রইল। রাগ লাগল ওর। সান্ত্বনা পুরস্কার পেলেই–বা কী!

বাচ্চারাও হতাশ। মীরা তো কেঁদেই দিল। কত আশা নিয়ে বসেছিল! ওর বেশি খারাপ লাগছে সাইফুলের জন্য। কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিল ও। পবন, শিপন সবাই সাইফুলকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ও চুপ। একদম চুপ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করবে এখন!

সবাইকে প্রধান বিচারকের হাত থেকে পুরস্কার নেয়ার আহ্বান জানালেন উপস্থাপক। বাচ্চারা চোখ কপালে তুলে দেখল তিতিনও যাচ্ছে পুরস্কার আনতে। ওর নাম বলল কখন!

–প্রথম পুরস্কার অধিকারিণী ঢাকার মেয়ে তাওফীকার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা তুলে দিচ্ছেন প্রধান বিচারক মহিউদ্দীন ভূঁইয়া। সাথে থাকছে আমাদের আগামী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের অনুমতিপত্র! উপস্থাপকের কথায় আরও বিস্মিত ছেলেপেলেরা।

তিতিনকে তাওফীকা বলছে কেন লোকটা! তিতিন কাঁদছে! একদৃষ্টে ও সাইফুলের দিকে তাকিয়ে আছে! সাইফুল নিস্তব্ধ!

–তাওফীকার অভিভাবক এসে থাকলে তাকেও সামনে আসার অনুরোধ করছি!

তিতিন কী যেন বলল উপস্থাপককে। তিনি হাত বুলিয়ে দিলেন ওর মাথায়।

–তিতিনের সব ক'জন আপনজনকে সামনে আসার অনুরোধ করছি। প্লিজ, সবাই সামনে আসুন। এক ঘোরের মধ্যে ওরা সবাই এগিয়ে গেল। সারাক্ষণ হৈ হৈ করা পিচ্চিগুলোর মুখে কোনো আওয়াজ নেই। কী বলবে ওরা?! ওদিকে উপস্থাপক, বিচারক, উপস্থিত সবাই অবাক। এরা কারা! প্রধান বিচারক মাইক্রোফোন তুলে নিলেন—

–আমার মনে হচ্ছে এই ছোট্ট ফুলগুলোর কোনো গল্প আছে। তাওফীকা কি আমাদের সেটা শোনাবে?

তাওফীকা ওর গায়ে থুতু ছিটানো থেকে নিয়ে সবকিছু খুলে বলল। কীভাবে অর্থ জোগাড় করেছে সেসবও বাদ দিল না। আসলে ও চাইছিল, ওই লোকটিকে অপমান করা হোক! মুখোশ পরা সমাজের গায়ে কিছু ছিদ্র তৈরি হোক।

ওই কর্তা ব্যক্তিটিকে ডাকা হলো। তবে নাম গোপন করা হলো। যতই হোক, আয়োজকদের একজন সে! মাথা নিচু করে সামনে এল। প্রধান আয়োজকের কথার কোনো সদুত্তর দিতে না পেরে তিতিনের কাছে মাফ চাইতে গেল। তিতিন পাশ

ঘুরে একদলা থুতু ফেলল মাটিতে। প্রধান বিচারক, উপস্থাপক, আয়োজক সকলেই দুঃখ প্রকাশ করলেন ওর কাছে। মান-সম্মান রাখতে দারোয়ান চাচাকে নিজের পকেট থেকে দুই হাজার টাকা দিলেন আয়োজক।

এরপর সান্ত্বনা পুরস্কার বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়ে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে প্রদর্শনীর তারিখ দেয়া হলো ১৯ সেপ্টেম্বর। আরও চৌদ্দ দিন পর। এর মাঝেই সকলকে তাদের প্রস্তুতি সেরে রাখার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হলো।

ভিড় থিতিয়ে এলে বাচ্চারা তাদের আসল রূপে ফিরে এল। মীরা তো তিতিনকে ছাড়েই না। জড়িয়েই আছে। সবার মধ্যে ওই এখনো শক্ত হতে শেখেনি। সবাই পিঠ চাপড়ে, ওদের মতো করে তিতিনকে স্বাগত জানাচ্ছে। তিতিনও খুশি, তবুও খুঁতখুঁত করছে। সাইফুল একবারও তিতিনের পিঠ চাপড়ে দেয়নি। ওর মুখেও হাসি নেই। কী হয়েছে ওর? উল্লাসের স্রোত কিছুটা থেমে এলে বাকিদেরও দৃষ্টিতে পড়ল বিষয়টা।

-এই সাইফুল, পবন ডাকল।

-কী?

-কী হইছে তোর?

-কী হইবো? সাইফুলের স্বরটা কেমন যেন।

-ওই সাইফুল, এবার পেছন থেকে ধাক্কা দিল শিপন।

ঝট করে ঘুরল সাইফুল। হঠাৎ কোত্থেকে যেন ফিরে এল ও।

-তিতিন কই?

তিতিনের মুখে হাসি ফুটল,

-সামনে দাঁড়াইয়া আছি, দেখস না?

সাইফুল খুশিতে তিতিনের নাক টেনে দিল,

-একবার তো বলতেও পারতি নাম পাল্টেছিস!

সাইফুলের কথা শুনে ওরা অবাক হয়ে গেল। তিতিনের সাথে থেকে থেকে সাইফুলও দেখি শুদ্ধ বুলি আউড়ায়! আর তিতিন ওদের সাথে থেকে ওদের মতো বলে!

–হের লিগা তুই এতক্ষণ কথা কস নাই?!

–আরে না! আমার মাথা কেমন ভনভন করতেছিল, কেমন যেন লাগতেছিল বলতে পারছি না!

ওহ! ঘোরের মধ্যে ছিল সাইফুল! থাকবেই–না বা কেন! এত পরিশ্রম বিফলে গেলে কে আঘাত পাবে না! ঠিক সে সময়ই অতি কাঙ্ক্ষিত কিছু হুট করে এলে ধাক্কাটা প্রবল হয়েই লাগার কথা!

সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে প্রায়। বাচ্চারা নাহয় কোনো এক ঠিকানায় চলে যাবে, কিন্তু ওরা দুজন? সাইফুল হাসল—

–তোরা ভাবিস না! এখন ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

–ওস্তাদের কাছে চল না! মাফ চাইলে ঠিক হয়া যাইবো!

–না রে! আমি যামু না! তোরা যা! মাঝে মাঝে তোগো লগে দেখা করুম নে!

নানাভাবে বুঝিয়েও হলো না। আলাদা হয়ে গেল ওরা। ছোট হলেও বিদায় শব্দটার সাথে ওরা আর দশজনের তুলনায় বেশিই পরিচিত। তবু এক আবেগ ঘিরে ধরল ওদের। সন্ধ্যার গোধূলির সাথে কিছু পবিত্র প্রার্থনাও প্রভুর দরবারে কড়া নাড়ল।

–রুমে তো গেলি না, যাবি কই?

–ওই চিঠির পর ওখানে যাওয়া সম্ভব? তিতিনও জানে সম্ভব না।

ওস্তাদের কাছে এক পিচ্চিকে দিয়ে দুই পৃষ্ঠার চিঠি পাঠিয়েছে সাইফুল। লেখিকা তিতিন। বলা বাহুল্য, ওতে ওস্তাদের জন্য সুখকর কিছু ছিল না। তবু যদি একটু বোঝে! বাচ্চাগুলো একটু শান্তি পাবে!

হাতে ত্রিশ হাজার টাকা, একটা ক্রেস্ট আর কার্ড নিয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দুই পথিক। ঠিকানা জানা নেই, করণীয় জানা নেই।

–দারোয়ান চাচার কাছে যাবি? উনি কিছু বলতে পারবে!

–হুম, সেটা যাওয়া যায়!

তারা ফিরল। চাচা ওখানেই বসে আছেন। ওদের দেখে মুখ উজ্জ্বল হলো। এগিয়ে

এলেন—

-কী, বাবারা?

-চাচা, একটা থাকার জায়গা হবে? ভাড়া দেব।

-থাকার জায়গা? দুজন থাকবা?

-জি চাচা। চিন্তায় পড়লেন চাচা।

দুইটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে কোথায় থাকতে পারে ভেবেও পেলেন না তিনি। অবশেষে বললেন,

-তোমরা চাইলে আমার লগে থাকতে পারো। তয় ভাড়া দিতে পারবা না। কিন্তু খাওনটা তোমরাই ব্যবস্থা কইরা নিও।

-না চাচা। এইটা হয় না। ভাড়া নিতে হবে। না নিলে আমাদের পথেই থাকতে হবে।

অনেক কথাবার্তার পর বিচ্ছু দুজনের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে এক হাজার টাকা নিতে রাজি হলেন চাচা। ওরা তখন তখনই দিয়ে দিল। চাচা ওদের বাসায় রেখেই চলে এলেন। যেখানে কাজ করেন, তার কাছেই এক বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি একাই থাকেন। স্ত্রী আর মেয়েটা গ্রামে থাকে। দূরে থাকলেও এখানের বেতন ভালো হওয়ায় তারাও ভালো আছে।

তিতিন আর সাইফুল। দুজনেই নীরব। আসলে বলার মতো কথাই পাচ্ছে না ওরা। এই বয়সে জীবনের এত ঘাত-প্রতিঘাত, নাটকীয় মোড় সয়ে ওঠা এত সহজ নয়। ওরা এখন ত্রিশ হাজার টাকার মালিক। এমনকি এক হাজার দারোয়ান চাচাকে দিয়েও ফেলেছে!

-এই! খাবি না? তিতিনের পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল।

-আজকে ভালো কিছু আনিস!

সাইফুলের চোখ ছলছল করে উঠল।

-পবন, শিপনরা তো ডাল আর ভাত খাচ্ছে!

তিতিন লজ্জা পায়। ওদের ফেলে ওরা কী করে ভালো খাবার খাবে!

-আমরাও ডাল-ভাত খাব!

-সত্যি? মন থেকে বলছিস?

–হ্যাঁ রে বাপ! এবার খাবার নিয়ে আয়!

সাইফুল দৌঁড়ে গেল। দশ মিনিটেই পলিথিনে করে ডাল আর ভাত নিয়ে ফিরে এল। গোগ্রাসে গিলল ওরা। চিবুতে চিবুতে তিতিন বলল—

–কাল কিন্তু আমরা ভালো কিছু খেতে পারি!

–কীভাবে?

–সকালে ওরা যখন বের হবে, আমাদের এখানে নিয়ে আসবি আর সবার জন্য ভালো নাস্তা কিনে আনবি।

সাইফুলের চোখ চকচক করে ওঠে। পরক্ষণেই দপ করে নিভে যায় চোখের জ্বলে ওঠা আলো—

–না রে! এই টাকা তোর ক্যানভাস, কালার আর ভালো পোশাক কিনতেই চলে যাবে।

–আমি বেশি আঁকার সময়ই পাব না। ছোট–বড় মিলিয়ে বড়জোর দশটা আঁকব। সবকিছু কিনেও আমাদের ঢের থাকবে!

–এক কাজ করি চল্!

–কী?

–এই চৌদ্দ দিনে আমাদের সব খরচের একটা হিসেব কর্। বাকি টাকা আমরা কিছু খরচ করে বাকিটা জমাব।

সানন্দে রাজি হলো তিতিন। সাইফুল শুধু মুখে বলে যাচ্ছে, তিতিন কাগজে লিখছে। হিসেব করছে।

–সাইফুল, একটা কথা বলি?

–বল্!

–কাল থেকে আমি তোরে একটু একটু করে পড়া শেখাব। শিখবি?

–যাহ্! কামে যাওয়া লাগবে না আমার!

–ও মাহ! কী করবি?!

–যা করতাম!

–এই কয়দিন কাজে যাওয়ার কথা চিন্তাও করবি না। আমার সাথে গল্প করবি

আর আর পড়াশোনা করবি!

–আমার লজ্জা করে!

তিতিন ফিক করে হাসে,

–ছেলেদের আবার লজ্জা! কালকে বাইরে গিয়ে আগে খাতা–কলম আর বাচ্চাদের বই কিনে আনবি।

–আগে দেখ্, টাকা কত বাঁচে!

–দেখেছি। মোটামুটি ভালোই খরচ করলেও আমাদের সাত হাজার বেঁচে যায়।

–এত!

–হ্!

ওরা টাকাগুলো চাচার খাটের চার পায়ার নিচে অল্প অল্প করে রাখে। এতে টাকাগুলোতে শক্ত ভাঁজ পড়ে যাবে, কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাববে না, ওখানে টাকা আছে। অবশ্য ওরা চুরির ভয়ও করছে না। কে জানে আর কেই–বা আসবে! চাচা ফিরতে অনেক রাত হবে বলেই গেছেন। ওরা মেঝেতে শুয়ে পড়ে। তিতিনের ব্যাগ আর সাইফুলের কাপড়–চোপড়ের গাট্টি ওদের বালিশ। শুয়ে শুয়ে ওরা স্বপ্ন আঁকে, অতীত ভুলতে চায়। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে ওদের ভালো লাগে। আজকের দিনটাই যে স্বপ্ন দেখার!

–তিতিন!

–হুঁ!

–এই প্রদর্শনীর পর যা–ই হবে, সেটা দিয়ে তুই স্কুলে ভর্তি হবি। একটা মেয়েদের হোস্টেলে থাকবি। আমি ছেলেমানুষ। যেকোনোখানে থাকতে পারব। তুই পারবি না।

–আর তুই? তুই পড়বি না?

–দুজনেই পড়লে খরচ জোগাবে কে! আমি কিছু একটা কাজ করব।

–এটা হয় না সাইফুল! আমি পড়ব আর তুই কষ্ট করবি!

–দেখ্ তিতিন! গোঁ ধরিস না! তুই পড়েছিস, এখনো পড়ার সুযোগ আছে। আমি একদমই পড়িনি। তা ছাড়া তুইও আয় করবি। এঁকে এঁকে আমাকে দিবি, আমি বিক্রি করব...।

তিতিন রাজি হয়। ওরা আরও অনেক কথা বলে। ভবিষ্যতের কথা, বড় হয়ে ওঠার কথা। সহস্র স্বপ্ন পোষা চোখ দুটো একসময় লেগে আসে। ওরা ঘুমায়। শান্তির ঘুম। বহুকাল পর।

পরদিন সকাল সাতটা। বাচ্চারা প্রতিদিনের মতোই বের হলো। কিন্তু সেই কোলাহল নেই। সাইফুল আর তিতিনের অভাব বোধ করছে সবাই। গলির মুখে এসে ছড়িয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় সাইফুলের দেখা পেল ওরা। ওদের দিকেই আসছে। সবাই একসাথে হুল্লোড় করে উঠল। যেন বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত চৈত্রের আকাশে মেঘের দেখা মিলেছে। কাছে আসতেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা সাইফুলের ওপর। ওদের বগলদাবা হয়ে সাইফুল বাসার পানে রওনা হলো।

দারোয়ান চাচা ততক্ষণে ডিউটিতে চলে গেছেন, অবশ্যই সাইফুলের আনা নাস্তা খেয়ে। তিতিন যথাসম্ভব রুমটাকে গোছগাছ করেছে। আজ ওর বাসায় মেহমান আসছে যে!

সবাই এসে গোল হয়ে মেঝেতে বসল।

–এই, তোরা এরপর কী করবি?

–প্রদর্শনী কী? ওতে কী হয়?

–আচ্ছা, এরপর কি তিতিন ওই যে বড় বড় মানুষ হয়, অমন হয়ে যাচ্ছে?

কত শত কৌতূহল শিশুমনে। ওদের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত করে তিতিন খাবারের প্যাকেটগুলো খুলল। আহামরি কিছু নয়। নান আর নেহারী। তা-ই যেন অমৃত! তাই যেন অশেষ উপাদেয়! এই খাবারটুকুন নিয়েই কতজনের কত মন্তব্য,

–এই দ্যাখ! আদা দিছে এইডাত!

–আরে না! আদা না! আমি একবার দেখছিলাম দই দেয়!

–খাইতে কিন্তু সেই মজা! আমার মায় একবার গরুর গোশ রানছিল, সেইরম মজা। মায় যহন আছিল, মজার মজার কত কিছু খাইতাম!

ওদের কাছে এসব কথা আর আবেগী ঠেকে না। অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক পর ওরা চলে গেল। সাইফুলও বের হলো ওদের সাথে। দরকারি

জিনিসগুলো কিনতে। তিতিন একা হয়ে গেল।

পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে বসল তিতিন। কিন্তু মন বসছে না। আজ মাকে খুব মনে পড়ছে কেন যেন! মা খুব খুশি হতেন। মজনু মিয়াও খুশি হতো। ওর জীবনটা আজ স্বাধীন, মা হয়তো ওপারে মিটিমিটি হাসছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বাদের পেছনে যে জীবনের সবটা বিস্বাদ সয়ে এসেছে! হঠাৎ কান্না এল তিতিনের। প্রচণ্ড কান্না। অনেক দিন পর। নির্জন রুমের দেয়ালগুলো ভিজে উঠল এক বঞ্চিত হাহাকারের অশ্রুমালায়।

ছোট রুমটিতে ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল দুটি কচি প্রাণের দিনগুলো। দিনের বেশির ভাগ সময় তিতিন মগ্ন তার আঁকাআঁকি নিয়ে, সন্ধ্যের পর এক-দেড় ঘণ্টা ও সাইফুলকে পড়াতে বসে। কিন্তু সাইফুলের পড়াশোনায় মোটেও মনোযোগ নেই। হাল ছেড়ে দিতে দিতেও তিতিন পড়িয়ে যাচ্ছে। যতটুকুই শিখুক, শিখছে তো! এভাবে কেটে গেল বারোটি দিন। পরদিন সকালে দারোয়ান চাচা কাজে চলে গেলে সাইফুল বলল, সেও বের হবে।

–কোথায় যাবি?

–শরীরটা একদম ভোতা হয়ে গেছে। একটু ঘষামাজা করে আসি। ওই দিক থেইক্যা একটু হেঁটে আসি।

–তাড়াতাড়ি আসবি!

–কেন? ভয় পাস একা?

'ভয় পাওয়ার কী?', ঠোঁট উল্টে বলল তিতিন, 'যখন মন চায়, আয় গো! ভাগ!'

সাইফুল হেসে বেরিয়ে যায়। ও ঠিক বোঝে, একা একা তিতিন ভয় পায়। তিতিন ঘুমের ঘোরেও ভয় পায়। প্রচণ্ড ভয়ে ও গোঙাতে গোঙাতে কী কী যেন বলে, ও ঠিক বোঝে না। শুধু এইটুকু বোঝে, তিতিনের জীবনে কিছু গল্প আছে, যে গল্পগুলোর আঁচ ও কাউকে পেতে দিতে চায় না। তাই জিজ্ঞেসও করেনি। প্রদর্শনীটা ভালোয় ভালোয় কেটে যাক, সুন্দর কিছু দিন আসুক। ও তখন অতীতের চাপা দেয়া ছাইগুলো খুঁড়বে। ছাই উড়িয়ে গড়বে স্বপ্নের শহর।

তিতিন মন দিয়ে রুম গুছাচ্ছিল আর গুনগুন করে গান গাইছিল। স্কুলে যখন পড়ত, ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় কত গান শুনেছে! বাবা না থাকলে মা এক আধবেলা বীণায় সুর সাধতেন, ছোট্ট তিতিনও গলা মেলাত। মা হাসতেন, গালে টোল পরা সে হাসির আওয়াজ আজও হৃদয়ে সুখের মতো কষ্টের জন্ম দেয়। সে কষ্ট বুকে পুষে ও সাজিয়ে তুলবে এক সুন্দর বাগান, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার বাগান।

হঠাৎ দরজা নক করার আওয়াজে মন ছুটে গেল ওর। সাইফুল এসেছে বোধহয়। দরজা খুলল এবং থমকে গেল। সেই লোকটা! যে থুথু ছিটিয়েছিল তার গায়ে! যাকে সবার সামনে অপমানিত হতে হয়েছিল তার জন্যে! আত্মা ধড়াস করে উঠল ওর!

–মা! কেমন আছ? হাসির মেকি ভাবটা লুকোতে পারল না লোকটা।

–ভালো আছি, স্যার। আপনি কেমন আছেন?

–তুমি আর ভালো থাকতে দিলে কই! কাষ্ঠ হেসে বলল লোকটা, 'শুনলাম এখানেই থাকো, তাই দেখতে এলাম। তা, এখানে কে কে থাকো?'

–চাচা, আমি আর আমার এক বন্ধু।

–দুই ছেলের সাথে তুমি একা মেয়ে থাকো! বোকা নাকি? এরচেয়ে বরং আমার বাসায় চলো, আমার স্ত্রী-মেয়ে আছে। ওখানে ভালো থাকবে। আর আমারও একটু ভালো লাগবে, আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি ভেবে।

তিতিন লজ্জা পেল। সেদিন আসলে অপমানটা খুব বেশিই হয়ে গিয়েছিল। মানুষটা খারাপ না। প্রতিটা মানুষ জীবনের কোনো-না-কোনো সময়, কারও-না-কারও কাছে খারাপ হয়ে যায়। এই লোকটির জন্যে সে সময়টা হয়তো ছিল সেদিন আর মানুষটা ছিল তিতিন।

–না, স্যার। আমার এখানে অসুবিধে হচ্ছে না।

–তোমার রুমে তো একটু ঢুকতেও দিলে না! আন্তরিক অভিযোগ মানুষটির স্বরে। আবারও লজ্জা পেল ও।

–ওহ্! স্যরি, স্যার। আসলে আপনাকে দেখে...।

–আমাকে দেখে ভয়ের কী আছে? আমি বাঘ না ভাল্লুক?! আমি সাধারণ লুৎফুর রহমান। চিত্র-বিচিত্রর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। এবার তো ঢুকতে দেবে? বলে নিজেই মাথা সেঁধিয়ে দিল লোকটা।

তিতিন ব্যস্ত হয়ে বিছানা ঝাড়তে লাগল। বিছানা ছাড়া বসতে দেয়ার মতো আর কোনো আসবাব ঘরটিতে অনুপস্থিত। কিন্তু আতিথেয়তায় ব্যস্ত তিতিন লক্ষ্যই করল না, পেছনে দরজাটা আলগোছে লেগে গেছে।

–বিছানা ঝাড়তে হবে না, তুমি এদিকে আসো। বলে তিতিনের হাত ধরে হেঁচকা টান দিল লোকটা।

লোকটার এই আকস্মিক পরিবর্তনে থতমত খেয়ে গেল তিতিন। শুরু হলো ধস্তাধস্তি, এরই মাঝে লোকটা বলে চলেছে—

–ক'বছরের ছুকড়ি! আমাকে করে অপমান! আমি দেখব তোর সম্মান কী করে থাকে...। তিতিন যখন শক্তি হারিয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার দ্বারপ্রান্তে, ঠিক সে সময় কড়াৎ করে দরজার আংশিক ভেঙে পড়ার আওয়াজ হলো। সাইফুল! তিতিন যেন বেহেশতী দূতের দেখা পেল!

–ওই ছেমড়া! বাড়াবাড়ি করিস না। যা কইতাছি! হিংস্রভাবে ধমকে উঠল লোকটা সাইফুলকে।

সাইফুলের তখন হুঁশ নেই। ঘরের কোনায় বটি রাখা ছিল, ও সেদিকে ছুটে গেল। হাতে নিয়েই ঘুরে দিল এক কোপ। এলোপাতাড়ি আরও দু-তিনটা কোপ দেয়ার পর লোকটা যখন পড়ে গেল, সাইফুলের হুঁশ ফিরল। তিতিন আর সাইফুল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। কী করল ও! না করেই-বা কী করতে পারত?

প্রথম বাক্যটা তিতিনের মুখ থেকেই বের হলো—

–সাইফুল, পালা!

–না, পালামু না!

–পালাতে তোকে হবেই! ক'দিন পর না হয় আসিস! আমার প্রদর্শনীর দিন! এর আগে আসিস না! যা!

সাইফুল নড়ে না। তিতিনের কী হলো কে জানে! পায়ে ধরে বসল!

–ভাই, চলে যা! এরা প্রভাবশালী, কখন কী করে বসে! তোর আঘাত আমার

সহ্য হবে না! তুই চলে গেলেই আমি লোকজন ডেকে একে পুলিসে দেব। প্লিজ, ভাই, তুই যা!

–আচ্ছা, আমাকে যখন তাড়াতেই চাইছিস, চলে যাচ্ছি। আর একদিনও আসব না!

বলেই পকেটে থাকা টাকা ক'টা ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

তিতিন কিছু বলতে পারল না। শুধু হতভম্ব, স্তম্ভিত, ভীত আর দিশেহারা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। ও কী বলল আর সাইফুল কী ভাবল। মুহূর্তেও মধ্যে ওর জীবনেই-বা কী ঘটে গেল! বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতেও পারল না ও, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

তিতিনের যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল চারদিকে সব সাদা। ও তাকিয়েই রইল। স্মৃতি এখনো নড়েচড়ে উঠতে পারেনি; কেন? কোথায়? কী হচ্ছে? এসব আবেদন এখনো অচেনা, তাই শুভ্রতায় তাকিয়ে থাকতে ভালোই লাগছে। পাশে অপরিচিত এক স্বর পেল—

–মাইয়াডা উঠছে, সিস্টাররে খবর দেওন দরকার। ও ঘাড় ঘুরাল।

গ্রামের মহিলাদের মতো শাড়ি পরা মানবীকে আদৌ কখনো দেখেছে কি না মনে করতে চাইল। কিন্তু তাকে মনে করতে গিয়ে সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনা মনে পড়ে গেল। শূন্য স্মৃতি ঝটপটিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে বসল ও।

ও হাসপাতালে! কে ভর্তি করল! আশেপাশে চেনাজানা কেউ নেই। কী করবে এখন ও? বসেই রইল দীর্ঘ একটা সময়।

–তোমার আব্বুর নাম্বারটা দ্যাও, আমরা ফোন দিয়া দেই। পাশের বেডের ওই মহিলা আবার বললেন।

তিতিন কথা বলে না। ওর তো বাবা নেই।

–তোমার কিছু মনে পড়ে না? তিতিন চুপ।

কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না, সাদার সমুদ্রে সাঁতার কাটতেই তো ভালো লাগছিল ওর। কেন উঠতে গেল? আবার শুয়ে পড়ল, চোখ বুজে পড়ে থাকল। সবাই ভাবল, আবারও অজ্ঞান হয়ে গেছে ও।

ওর মনের উঠোনে এক এক করে উঁকি দিতে লাগল মা, বাবা, মজনু শেখ, শাকিল, রিমেন, সাইফুল, পবন, শিপন...। সবাই! এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর কপোল বেয়ে। অশ্রু নয়, যেন সব বেদনার জমাটবাঁধা এক ফোঁটা রক্ত। হৃদয় খুঁড়ে বেয়ে পড়া রক্তের রং বুঝি স্বচ্ছই হয়!

বয়ে যাওয়া অশ্রু দেখে পাশের মহিলা ভাবলেন, মেয়েটি তাহলে অজ্ঞান হয়নি! ঘুমিয়েছে। ঘুমের ঘোরে কাঁদছে। উঠে গেলেন সিস্টারকে ডাকতে। কিছুক্ষণ পরই সিস্টার উপস্থিত হলেন।

–তাওফীকা, তিতিন চোখ খোলে। এই নামে ডাকছেন কেন ওকে সিস্টার?

–খারাপ লাগছে? একটু অপেক্ষা করো, তোমার আঙ্কেলকে এখুনি ফোন দিচ্ছি। বলে বেডের পাশের টেবিল থেকে ফাইল নিয়ে কার নম্বর যেন বের করলেন। কল দিয়ে কাকে যেন জানালেন, ওর জ্ঞান ফিরেছে। সংযোগ কেটে গেলে বললেন,

–তোমার আঙ্কেল সন্ধ্যের পর আসবেন। ডিউটিতে আছেন তো এখন...। একটু অপেক্ষা করো খুকি। তার কাজ শেষ, তিনি চলে গেলেন।

তিতিন বুঝল দারোয়ান চাচা ওকে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, ও এখন কী করবে? জানা নেই।

সন্ধ্যের পর চাচা এলেন, জটিল কোনো অসুখ না হওয়ায় রিলিজ পেয়ে গেল তিতিন। চাচা বাসায় নিয়ে এলেন। এর মাঝে তিতিন একটা কথাও বলেনি। চাচার সব প্রশ্ন যেন ও শুনতেই পাচ্ছে না।

আসলে ওর কথা বলতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। বাসায় ফিরে চাচা খাবার দিলেন। তিতিন খেল না, ওষুধও না। গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর দুজন পুলিস এল। অদ্ভুত! দুজন পুলিশ দু–রকম। একজনের কাঁধে কোনো ফুল নেই, শীর্ণকায়, বয়সও অল্প। আরেকজনের ইয়া বড় ভুঁড়ি, মনে হয় আস্ত একটা ফুটবল গিলে খেয়েছে, কাঁধে দুটো ফুল। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে ফুল স্পিডে, তিতিনের মাথাও যেন ঘুরছে সমান্তরালে, শীতে ওর শরীরও কেঁপে কেঁপে উঠছে। শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসছে কি না কে জানে? ফ্যান বন্ধের সুযোগ নেই। কাঁধে ফুলওয়ালা পুলিশের ভুঁড়ির সাথে শার্ট ল্যাপটে আছে ঘামে। একটু পরপরই সে ফ্যানের দিকে তাকাচ্ছে আর ডান হাতের আঙুলগুলো একসাথে করে কপাল থেকে ঘাম মুছছে।

ওরা তিতিনের জবানবন্দি নিতে এসেছে। কোনো কথাই বলতে মন চাইছিল না তিতিনের, তবুও বলতে হল ভয়ে ভয়ে এবং অনেকটা বাধ্য হয়ে। ছোট্ট তিতিনও জানে, এসব জবানবন্দির কোনো মূল্য নেই। যাদের কাগুজে টাকার গরম আছে, কাগজের রুল-রেগুলেশন আইন তাদের জন্য নয়। এসব তাদের জন্য, পুলিশের ভুঁড়ির চাহিদা মেটাবার শক্তি যাদের নেই।

পুলিশ চলে গেল। তিতিন উঠে বসতে চাইল। নাহ! উঠতে ইচ্ছে হলো না। মনে হয় ওর ইচ্ছে করার শক্তিগুলো মরে গেছে। ওর যেন কিছু মনে পড়তে চাইছে। কিন্তু নাহ! কিছুই মনে পড়ছে না... সব ধূসর। মস্তিষ্কে ওর চিন্তার সেলগুলোও যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে ফুটো বেলুনের মতো করে। ও শুয়েই রইল। না ঘুমাল, না কিছু ভাবল। কেমন এক নির্লিপ্ততা আর উদাসীনতা ওকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। এভাবেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তা নিজেও জানে না।

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল ওর। কালো চাদর ঘেরা চারপাশ। নীরব নিস্তব্ধ রাত। কাছেই একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। ঘুম ভাঙার কোনো কারণ পেল না ও, বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। তখনই শুনতে পেল আওয়াজটা। খুব ক্ষীণস্বরে কেউ কাঁদছে, খুব কাছে। কে হতে পারে? চাচাকে আওয়াজ দেবে? ইচ্ছে হলো না। টের পেল, ভয়ে শিরদাঁড়া দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু সময়, আবার সব চুপ। একদম নিঝুম। ভুল শুনেছে ও। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টায় রত হলো। নাহ! আবারও চাপাস্বরে কান্নার আওয়াজ।

এবার আর সামলাতে পারল না তিতিন, 'চাচা' বলে চিৎকার করে উঠল। এক মুহূর্ত পরেই লাইট জ্বালালেন চাচা।

–কী হইছে, মা? তিতিন দেখল চাচার মুখে কান্নার রেখা। বিছানায় বিছানো জায়নামায।

ও! চাচাই কাঁদছিলেন! লজ্জা পেল তিতিন।

–কিছু না, চাচা। ভয় পেয়েছিলাম।

–ক্যান?

–কান্নার শব্দে।

হাসলেন চাচা,

–এইটা আমার কান্না না রে, মা, সারাদিনে এই সময়টাতেই আমি একটু সুখ পাই।

মনে হয়, আর কেউরে কইতে পারি বা না পারি, আল্লাহরে তো কইতে পারি! একটা আপনজন আছে, যে আমার কথাগুলা শুনব। কী যে একটা শান্তি! সাইফুল থাকায় নামাযের জায়গা পাইতাম না এতদিন, হের লিগা ডিউটিতে গিয়া পড়তাম। তোমার ঘুম ভাঙাইলাম, মা!

–না, চাচা। সমস্যা নাই!

চাচা লাইট নিভিয়ে দিলেন। শুয়ে শুয়েই খাটের ওপর থেকে জানতে চাইলেন—

–তুমি খুব ডরাইছিলা, না? ভদ্র পোশাক পরা মানুষগুলা অমনই হয়। দেখতে সুন্দর, ভেতর দিয়া খবীস। এখন ওইড়া হাসপাতালে। ডাক্তার কইছে, বাঁচব না মরব ঠিক নাই। তয় সাইফুল কই গেছে কইতে পারি না। তুমি জানো?

–না, চা...। আর কিছু বলতে পারে না তিতিন। অঝোরে কান্না আসে ওর।

ও কাঁদে! চাচা একটু আগে যার কাছে কেঁদেছেন, তাঁর কাছে। ও তাঁকে চেনে না, কিন্তু চাচার আন্তরিকতা তাঁকে চেনার উৎসাহ জুগিয়েছে।

–ওয়াও! আপনি এত সুন্দর গাইতে পারেন!

রাতের নীরবতার মাঝে আইদার উচ্ছ্বাসিত স্বর বড় বেশিই কানে বাজে তাওফীকার।

–এখন তো সুর, তাল, লয় হারিয়ে গেছে। অবশ্য সবকিছুর ঠিকঠাক সুর কখনো আমার স্বরে আসেওনি। জীবনটাই কেটে গেল এভাবে! সুর সাধনার সময় পেলাম কই!

আইদা উত্তর দেয় না। এসব কথার উত্তর দেয়া যায় না।

তাওফীকা ওঠেন,

–আইদার ঘুম পেয়েছে?

–না, আপু।

রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে আসলেই ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল না আইদার।

–ঠিকাছে, তুমি তাহলে বসো।

বলে ওপরে আনা ব্যাগ থেকে একটা জায়নামায বের করলেন তাওফীকা।

ও ভাবত, ওদের মতো মানুষেরাই বুঝি শুধু মাঝেসাঝে নামায পড়ে! সমাজের এই পর্যায়ের লোকেরা বুঝি নামায পড়ে না! তাওফীকাকে নিয়মিত নামায পড়তে দেখে ওর এ ভুল ধারণা ভেঙেছে। ও-ও কতদিন ধরে যে নামায পড়ছে না! তাওফীকাকে নামাযে দাঁড়াতে দেখে ও লজ্জা পেল।

–আইদা, এই নামাযে যে কী প্রশান্তি! যেদিন থেকে বুঝেছি সেদিন থেকে আর ছাড়ি না। কখনো কখনো অবশ্য ছুটে যায়। যেমন আজ দুপুরে! কিন্তু ছুটে গেলে মনেও কেমন ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। আমার মনে হয় কি জানো? নামায এমন এক সাধনা, যা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়। মাথা উঁচিয়ে বেঁচে থাকার পথ দেখায়!

আইদা যদিও নামায পড়ে না এমন না, কিন্তু ওর কাছে কখনো নামাযকে এমন লাগেনি। তাই কিছু বলল না। ওর নীরবতায় তাওফীকা হাসলেন—

–আমার কথাকে কেমন অসম্ভব লাগছে, না? আসো, প্রমাণ দেখাই! ওযু করতে পাঠালেন আইদাকে তাওফীকা। এরপর সেও এক জায়নামায নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাওফীকা বললেন—

–শোনো, তুমি এখন নামাযে দাঁড়াচ্ছ।

নামায কী জানো? নামায হলো, অন্তরে যত কালিমা ও যত সুপ্ত কলুষতা আছে, সবকিছুকে মুছে দিয়ে নতুনভাবে পথ চলার অঙ্গীকার!

নামায হলো এমন এক সত্তার সামনে ধরনা দেয়া, যার কাছে নত হওয়া ছাড়া গতি নেই!

নামায হলো, এমন এক আপনজনের কাছাকাছি হওয়া, যে তোমাকে ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি। তোমার সন্তানকে তুমি ভালোবাসো কতটা? তারচেয়েও তিনি তোমাকে বেশি ভালোবাসেন!

নামায হলো, এমন এক প্রেমময় সত্তার সাথে কাটানো একান্ত মুহূর্ত, যিনি তোমার বিপদে হন সমব্যথী, আনন্দে হন উত্তম সঙ্গী। আর এই সত্তাকে মনের সব, সবকিছু খুলে বলার মাধ্যম হলো এই নামায!

আজকের এই কষ্ট, ভাবনা, চিন্তা সব—সবকিছু তুমি নামাযান্তে তুলে ধরো তার দরবারে, একান্ত প্রিয়জনের মতো করে। দেখবে অপরিচিত এক অনুভূতি কাজ

করবে অন্তরজুড়ে! এবার দাঁড়াও!

অন্ধকার রাতে দুই মানবী দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে। নীরব, স্নিগ্ধ রাত থমকে গেল। তারাদের উজ্জ্বলতা বেড়ে গেল। চাঁদ যেন উল্লাসে ঝিকমিক করে উঠল।

এ এক প্রেম—অনন্ত ভালোবাসা!

এক দৃশ্য—কখনোই ভুলতে না চাওয়া!

দূরে কোথায় যেন এক প্যাঁচা ডেকে উঠল, এই পবিত্র সময়ে সে ডাকটাকেও মনে হলো যেন প্রেমসুধায় আকুল!

নামায শেষ হলো। আইদার মনে হলো, জীবনে আজ প্রথম ও নামায পড়ল। এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে মন ভরে গেল। এক স্নিগ্ধতার পরশ দেহ-মনে শীতলতা ছড়িয়ে দিল।

–আপু কি ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন?

তাওফীকা যেন খুশি হলেন। অন্ধকারে সাদা সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিকিয়ে উঠল,

–উঁহু, খুব বেশি না। জীবনের প্রথম প্রদর্শনীর আগে আমার জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে। আমি এতই ভেঙে পড়ছিলাম যে, সিদ্ধান্ত নিলাম এতে অংশ নেব না। কিন্তু আমার আশ্রয়দাতা চাচা খুব বোঝালেন। বললেন, 'এতদূর হেঁটে পিছু ফিরে যাওয়া লজ্জার। তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে, তুমি সাধারণ নও! কেউ চাইলেই তোমাকে ছুকরি বা রাস্তার মেয়ে বলতে পারবে না। এই দুর্ঘটনার কারণে তুমি এক আপন মানুষ হারিয়েছ, এখন যদি জীবনের পথেও হেরে যাও, তার এই চলে যাওয়ার মূল্যায়ন হবে, বলো? এভাবেই, প্রতিদিন বোঝাতে বোঝাতে চাচা আমাকে প্রদর্শনী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এই চাচার সাথেই একটু একটু করে নামায পড়তাম। চাচার মুখে নবীর কথা শুনতাম। কিন্তু আমি এতই ভেঙে পড়েছিলাম যে, চাচার কথা আমার ক্ষতে প্রলেপ লাগাল মাত্র; শুকিয়ে দিতে পারল না। তাই প্রদর্শনী শেষ হওয়ামাত্রই আমি চাচাকে একটা চিঠি লিখে আর কিছু টাকা রেখে বেরিয়ে পড়ি। পথের মেয়ে পথের ধুলো গায়ে মেখে ছুটতে থাকি এদিক-সেদিক। এক আপন মানুষকে খোঁজার আশায় আমার পেরিয়ে যায় দিন। রাতটা হয় ভয়ংকর! একা মেয়ে। নির্জন রাস্তায় নিশিকন্যাদের আনাগোনায় নিজেকে কেমন অস্পৃশ্য লাগতে থাকে। এক পার্কের ঝোঁপের কোনায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাতটা কাটাই। সকালেই উপলব্ধি করি, আমাকে বাঁচতে হলে আশ্রয় লাগবে আর আমার কোনো আশ্রয় নেই। অথচ আমার হাতে তখন প্রচুর টাকা। নগদ পঁয়তাল্লিশ হাজার।

প্রদর্শনী থেকে আয়। কিন্তু তা দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই। কারও কাছে আমি নিরাপদ না। জীবনটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে আমার কাছে। আমি আবার বাঁচার আশা হারিয়ে ফেলি। মা কী শান্তিতে আছেন ভেবে আত্মহত্যার চিন্তা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আমার মনে। দ্বিতীয়বার।...

দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা। এবার তিতিন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আর থাকবে না এ দুনিয়াতে। বাবা নেই, মা নেই। নেই কোনো আপনজন। আশ্রিতা তিতিন কোনো আশ্রয়দাতার কাছেও পায়নি এতটুকু ভালোবাসা। দ্বারে দ্বারে করুণার পাত্রী হয়ে নিগৃহীত হয়েছে কত দিন!

কত দিন হবে? মনে হচ্ছে সহস্র বছর ধরে এ ধরণি তার ভার বইছে। দু-মাস আগে তার জন্মদিন গেল! অথচ সে টেরই পায়নি! দশের কোটা ছুঁই ছুঁই করতে থাকা তিতিন কি বারোটা দিন শান্তিতে ঘুমুতে পেরেছে?

সাইফুলের সাথে দিনগুলো ছিল প্রাণবন্ত, কিন্তু মুহূর্তমাত্রও কি অতীত তাকে ছেড়েছে? রিমেনের মুখাবয়ব কি এখন, এই মুহূর্তেও তাকে তাড়া করছে না? কিন্তু কেন? কী দোষ তার! জন্মের আগেই কি অমার্জনীয় কোনো পাপ করে বসেছিল সে?

স্রষ্টার ওপর অভিমান জমে পাহাড় হয়ে ওঠে ওর[১]। সমস্ত অনুভূতি এক জায়গায় এসে জড়ো হয়—হতাশা। ধিক্কার। একাকিত্ব। এই ছোট্ট মেয়েটি কি তা বহন করতে সক্ষম? না! তাই সে মরতে চায়। চলে যেতে চায় পৃথিবী থেকে। এ পৃথিবী যে ওকে চায় না!

কিন্তু কীভাবে মরবে? পানিতে ডুবে মরার অভিজ্ঞতা তার হয়ে গেছে। সে পারবে না। তবে? মা ফ্যানের সাথে ঝুলে মুক্তি নিয়েছেন। তবে কি সেটা সহজ? কাঁধের ব্যাগ খুলে তিতিন। বের করে আনে সে তোয়ালেটা। দীর্ঘদিন পর ঘ্রাণ শুঁকে বুক ভরে। মা! আমি আসছি!

হঠাৎ এক বিশাল পাথর যেন নেমে যায় তার বুক থেকে। ফুরফুরে লাগতে থাকে নিজেকে। আহ! আর কিছুক্ষণ! জগৎ সংসার থেকে মুক্তি! তোয়ালেটা বাঁধবে

[১] ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে যা হয়...।

কিসে?

একদম সকাল। পার্কে লোকজন তেমন নেই। হঠাৎ এক আধজন পথচারী যাচ্ছেন। ফজর পড়ুয়া মুসল্লীরা সালাত আদায় শেষে পার্কের ভেতর দিয়ে ফিরছেন। আরেকটু ভেতরে গেল ও। হ্যাঁ, এবার কিছু দেখা যাচ্ছে না পথ থেকে। ওর মরতে কয় মিনিট লাগবে? পাঁচ? দশ? পনেরো মিনিট? এর মধ্যে কেউ এদিকে আসার কথা না।

ইতিউতি তাকিয়ে কয়েকটা উঁচু পাথর জোগাড় করল। সেগুলোর ওপর উঠে একটা ডালে তোয়ালে গিঁট দিল। টেনে দেখল শক্ত হয়েছে কি না। হুমমম! সন্তুষ্ট হয়ে এবার নিজের গলায় বাঁধার জন্যে মনকে প্রস্তুত করল।

তিতিন নিজের কাজে এতটাই মগ্ন যে অন্যদিকে খেয়ালই নেই। তাই পেছন থেকে এগিয়ে আসা চড়টা খুব কড়া করেই কানে লাগল। এক মুহূর্ত মনে হলো, কানের পর্দা ফেটে পড়ে গেল বুঝি! পুরো পৃথিবী যেন থমকে গেল। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, পেছন থেকে কেউ ওর গালে আঘাত করেছে। ভয়ানক রাগে ওর মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। পারলে মানুষটিকে ছিঁড়ে খাবে!

ঘুরেই অবচেতনভাবে হাত তুলে মারতে গেল, কিন্তু তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে আরও কয়েকটা থাপ্পড় দিল মানুষটা। স্তম্ভিত তিতিনের ব্যথায় চোখে পানি চলে এল। ঘোলা চোখ তুলেই তাকাল মানুষটির দিকে। অপরিচিত চেহারা। রাগে থমথম করছে। আধাপাকা দাড়ি-গোঁফের মাঝে পান খাওয়া মুখটা গম্ভীর হয়ে আছে। সব মিলে ভয় পেল তিতিন। লোকটা ওকে কেন মারল?!

–মশকরা পাইছো মেয়ে? বাবা একটু বকা দিল, মা একটু শাসন করল। ব্যস, তোমরা ঝুলে যাও! এক মুহূর্তের ব্যথায় বাবা-মায়ের সারাজীবনের ত্যাগকে তুচ্ছ করে ফেলো। তোমার বাবার নম্বর দাও!

লোকটা একরকম গজরাচ্ছে। তিতিন কথা বলে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে। লোকটা কিছু বলে না। ওকে কাঁদতে দেয়। তিতিনকে ধরে রাখা হাতটা শিথিল হয়ে যায় অজান্তেই। অমনোযোগিতার সুযোগে তিতিন দৌড় দিতে চায়। কিন্তু লোকটা দ্রুতই আবার তাকে ধরে ফেলে।

–তুমি তোমার বাবার নম্বর দিবা নাকি আমি পুলিশে খবর দিব?

তিতিন চুপ করে বসে থাকে। ওর কান্না থিতিয়ে আসে। ও কেন কাঁদছে? বেঁচে

থাকার কষ্টে নাকি আপনজনের অভাবে? নাকি.. লোকটার কল্যাণকামিতা ওর মনকে আবার দুর্বল করে দিয়েছে? না! দুর্বল হলে চলবে না! লোকটার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে তাকে তার লক্ষ্য পূরণ করতেই হবে! লোকটা তিতিনের উত্তর না পেয়ে পুলিশের নম্বর ডায়াল করতে থাকেন। তিতিন স্পষ্ট গলায় বলে,

–আমার বাবা নেই।

–মায়ের নম্বর দাও!

–মা নেই।

–গার্ডিয়ান কে? তার নম্বর দাও!

–আমার কেউ নেই!

–এই মেয়ে, আমাকে বোকা বানাও?! বেশি চালাকি শিখছো তোমরা...।

–আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু আমার প্রতিটি শব্দ সত্যি।

লোকটা এবার থমকে যায়। এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কেউ মিথ্যে বলতে পারে না। হাত ধরে তিতিনকে নিয়ে পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে।

–বলো তো বাবা, তুমি কেন আত্মহত্যা করতে চাইছ?

–শুনে কী করবেন? করুণার দৃষ্টি ফেলে সান্ত্বনা দেবেন? আশ্রয় দিতে চাইবেন? আমার সেসব কিচ্ছু লাগবে না। আমাকে আমার মতো ছেড়ে দিন। আমার প্রস্থানে বেঁচে থাকা কারও কিছু যাবে, আসবে না।

লোকটা বুঝলেন, তিতিনের এখন বুকভরা অভিমান, অসহনীয় কষ্ট।

–বাবা, আমি তোমাকে কিছুই বলব না। শুধু একটু শুনব।

–বলতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।

–কী?

–শুনে আমাকে আমার মতো ছেড়ে দেবেন।

লোকটা কী ভাবলেন, কে জানে! ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন। তিতিন আবারও বলল, 'ছেড়ে দেবেন তো?'

লোকটি মাথা নাড়াল। তিতিন শুরু করল ওর গল্প। সব বলল। সে জানে না, কেন তাকে সব বলছে। শেষ মুহূর্তের তাড়না তাকে গল্পের মাঝ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে নাকি মুহূর্তকালের আবেগী দুর্বলতা তাকে বলতে উৎসাহ জোগাচ্ছে?

সে জানে না। কিন্তু ওর বলতে ভালো লাগছে। কখনো হাসল, কখনো কাঁদল, কখনো-বা দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল সাহসের ইঙ্গিত দিল।

ভোরের পাখিরা সবে জেগে কলরব করতে শুরু করেছে। হালকা বাতাসে পাতারা নড়ে সজীবতার আভাস দিচ্ছে। কোত্থেকে যেন বকুলের গন্ধ আসছে। কিন্তু সে গন্ধ বুক ভরে টেনে নেয়ার মতো মন নেই পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা মানুষ দুজনের। তাদের অশ্রুতে ভিজছে স্নিগ্ধ সকাল।

–বাবা, আমি আমার কথা কথা রাখব। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু এর আগে একটা গল্প শোনাই। শুনবে তুমি?

তিতিন চোখ মুছে ঘাড় নাড়ে।

–ছোট্ট এক পিচ্চি। বাবা জানতেন, সন্তান হবে। উৎফুল্লতায় অপেক্ষা করছিলেন, মুখখানি দেখবেন বলে। কিন্তু তাকদীর! জন্মের আগেই বাবা মারা গেলেন। মায়ের কোলও হারালেন একেবারে অল্প বয়সে। দাদার কোলে মাথা গুঁজতেন তিনি। কিন্তু কই! দাদাকেও হারালেন কিছু দিনের মাথায়। চাচার হাত ধরে পথ চলতেন তখন। কিন্তু ঘটল এক ঘটনা! সবাই তাকে ছি ছি করতে শুরু করল। চাচা ছাড়া আর কেউ নেই তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিতে। গুটিকয়েক লোক ছাড়া। রাস্তায় বের হলেই পাথর ছুড়ে মারে। এলাকার বখাটেরা পাগল পাগল বাচ্চাদের লেলিয়ে দিত, কুকুর লেলিয়ে দিত। আঘাতে হতেন রক্তাক্তও। কিন্তু জানো! একবারও আত্মহত্যার কথা ভাবেননি তিনি! ভাবেননি, তাঁর কেউ নেই! ভাবেননি কী তাঁর অন্যায়! কেন এত আঘাত সইতে হচ্ছে! ধৈর্যের এক অটল পাহাড় ছিলেন তিনি। এরই মাঝে চলে গেলেন চাচা। সুযোগ পেয়ে লোকেরা তাকে দেশছাড়া করে ছাড়ল! অনেক বছর তিনি দেশে যেতে পারেননি। পিতৃভূমির ছায়ায় একটু ঘুমাতে পারেননি। কিন্তু সেই তিনি নিজের পথে এগিয়ে গেছেন, অদম্য সিংহের চেয়েও দৃঢ়তার সাথে। মুহূর্তের জন্যেও হতাশ হননি।

আরেকজনের গল্প বলি। তখন দাসপ্রথা। কালোদের ধরে ধরে দাস বানিয়ে দিত যুদ্ধবাজ জাতিরা। করত অমানুষিক অত্যাচার। তিনিও অত্যাচারী মনিবের ফুট-ফরমাশ শুনতেন আর অত্যাচার সইতেন, খাবারটাও পেতেন না ঠিকমতো। একপর্যায়ে তার ওপর অত্যাচার এত বেড়ে গেল যে, মনিবরা তাকে মরুভূমির উনুনসম সূর্যের নিচে পাথরচাপা দিয়ে রাখত। যন্ত্রণায়, ক্ষুৎ-পিপাসায় জিভ বের হওয়ার মতো হতো। অথচ সেই তিনি একটি বারের জন্য আত্মহত্যার ভাবনাও মাথায় আনেননি।

আচ্ছা, বাবা, তুমি কি তাদের চেয়ে কষ্টে আছ?

তিতিন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। লোকটির প্রশ্নে থমকে গেল। তাই তো! তার কষ্ট তো এতটা নয়!

–লোক দুজনের শেষে কী হয়েছিল?

লোকটি হাসলেন, 'প্রথমজন ছিলেন আমাদের নবী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর দ্বিতীয়জন হলেন বেলাল রা., ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন।

তিতিন অবাক হয়ে গেল! এঁদের নাম তো শুনেছে! কিন্তু এঁদের এত কষ্ট ছিল!

–তাঁরা এত কষ্ট সহ্য করতেন কেন? মরে গেলেই তো হয়!

–বাবা, তখন ইসলাম কেবল পৃথিবীকে ছায়া দিতে শুরু করেছে। মুসলিমরা তখন কেবল হাঁটতে শিখেছে। সে সময় তারা সবাই অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, সেসব শুনলে তুমি বুঝবে তোমার কষ্ট সেসবের কাছে কতটা ছোট। মা ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধে বাবার হাতে ছেলে, ভাইয়ের হাতে ভাই মারা গিয়েছেন। তবুও তারা কখনো আত্মহত্যার কথা ভাবেনওনি। কারণ, তাঁরা নিজেদের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন আল্লাহকে। আর আল্লাহ আত্মহত্যা থেকে নিষেধ করেছেন যে!

শোনো, আল্লাহ বান্দাদের কষ্ট দেয়ার পেছনে অনেক হিকমাত আছে। কখনো বান্দা গুনাহ করে ফেলে আর আল্লাহ চান, মৃত্যুর পর কষ্ট না দিয়ে তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিই। আবার কখনো চান, বান্দাকে পরীক্ষা করে দেখতে, সে কতটা সবর করতে পারে! আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারে! যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদের পরবর্তী সময়ে এত সুখ দেন যে, তা তারা কল্পনাও করতে পারে না! আবার কখনো আল্লাহ চান কাউকে দিয়ে বড় কোনো কাজ আদায় করতে। সে জন্য কষ্ট দিয়ে তাকে পোড় খাইয়ে প্রস্তুত করেন।

মানুষ যখন ভেঙে পড়ে এবং পরাজিত হয়ে যায় জীবনের পথে, তখনই সে আত্মহত্যা করে। বিজয়ী মানুষ তো কখনো আত্মহত্যা করতে চাইবে না; বরং সংগ্রাম করে সবকিছু ছাপিয়ে সফল হবে।

তিতিন মন দিয়ে শুনছিল। প্রতিটি শব্দ যেন ওর জন্য নতুন কোনো পথ। নতুন কোনো আহ্বান। অন্তরের মধ্যে সবকিছু যেন ভেঙেচুরে আবারও নতুন করে গড়ে উঠছিল। আবারও এক দ্বিধা ওকে ভেতরে-বাইরে ঘিরে ধরল—কী করবে সে?

–এবার আমায় যেতে দিন।

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

–আমি আমার কথা রাখছি। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও—এখনো কি তোমার মৃত্যুর ইচ্ছে আছে?

তিতিন কী উত্তর দেবে? ও নিজেই এখন মাঝামাঝিতে। মাথা নাড়ল।

লোকটি খুশিতে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাঁটা শুরু করলেন। তিতিনও উঠতে গেল। কিন্তু কী ভেবে আবার বসে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ একভাবে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিতিন ইতিকর্তব্য ঠিক করে নেয়। পাশেই একটি খাবার হোটেল। আগে পেটের আগুন নিবৃত্ত করা দরকার।

ব্যাগে হাত দিল। কিছু খুচরো বের করে পরোটা আর ভাজি খেল। অনেকদিন পর। তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে ভাবল, আর যা হোক! কখনো খাবারের কষ্ট করবে না! হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ও।

হোটেল বয়ের কাছে ফাঁকে জেনে নিয়েছে কাছের স্কুলটা কোথায়। বেশি দূর না, কয়েক কদম হাঁটতে হলো কেবল। স্কুলগেইট দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে অফিসের সামনে এল। কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, জানা নেই। দুরু-দুরু বুকে গেইট খুলে অনুমতি চাইল, 'আমি কি আসতে পারি, স্যার?'

টেবিলের ওপাশে ক্লিনশেভ মধ্যবয়সী এক লোক বসা।

–হুম! এসো! গম্ভীর স্বর।

তিতিন ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

–কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? কেন এসেছ?

–স্যার, আমি পড়তে এসেছি।

–মানে কী? তুমি পড়ো না এখন?

–না, স্যার। আমি ভর্তি হতে এসেছি।

এবার ওর পেছনে তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন।

–তোমার গার্ডিয়ান কোথায়?

সবখানে এক প্রশ্ন! ওকে দেখে কি এখনো খুকি মনে হয়? মানুষগুলো কেন চেহারা দেখে বোঝে না, ওর জীবন ওকে অনেক বড় করে দিয়েছে?

–আমি একাই এসেছি, স্যার। আমার গার্ডিয়ান নেই।

স্যারের চোখ কপালে উঠল। এবার ওর বেশভূষার দিকে ভালোমতো তাকালেন—

–বাড়ি থেকে পালিয়েছ নাকি?

–আমার কোনো বাড়ি নেই।

–মশকরা করছ! তোমার বাবা–মা, আত্মীয়...?

–স্যার, আমার কেউ নেই। বিশ্বাস না হলে এই দেখুন...।

বলে ওর আর্ট প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণের ফরম ও সার্টিফিকেট দেখাল, যাতে বাবা মরহুম লেখা, অভিভাবকের স্থানে 'নিজ' লেখা। এবার স্যারের আরও অবাক হওয়ার পালা। একা একা এইটুকু মেয়ে এদ্দূর এসেছে!

–বাবা–মা কবে গত হয়েছেন?

–দেড় বছরের বেশি হবে।

–তুমি টাকা পাবে কোথায়?

–স্যার, এখান থেকে কিছু টাকা এসেছে। ভর্তি হয়ে যাবে। বাকিটার ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

ছোট্ট মেয়েটির পাকা পাকা কথায় স্যার বুঝলেন, এ আর সব মেয়ের মতো নয়। ভিন্নধাতের। ভর্তি করে নিলেন তিনি। সেখানে বাঁধল বিপত্তি। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার সুবাদে ইংলিশ তো কড়কড়ে, অনায়াসে সিক্সে ভর্তি করে নেয়া যায়। বাংলার মানও বেশ ভালো। সম্ভবত পারিবারিক শিক্ষায় সম্ভ্রান্ত। কিন্তু অঙ্ক নিয়ে বাঁধল বিপত্তি। নানা সংশয়ের পর ওকে সিক্সেই ভর্তি করলেন স্যার। কিন্তু কড়া স্বরে বললেন, কারও কাছে গণিতটা প্রাইভেট পড়তে।

বিদায়ের সময় জানতে চাইলেন, 'থাকবে কোথায়?'

ইতস্তত মাথা ঝাঁকাল তিতিন। জানা নেই। স্যার চিন্তায় পড়লেন। একা এক মেয়ের বেঁচে থাকার জন্যে সমাজটা বড়ই অনুপযোগী। প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ এ সমাজ।

–লেডিস হোস্টেলে থাকতে পারবে?

লেডিস হোস্টেল! তার মানে শুধু মেয়েরা? ও যেন আকাশের চাঁদ পেল! পারবে মানে, ওর জন্যে তো স্বর্গ! মাথা নাড়ল ও।

–কিন্তু ওখানে এত কম বয়সে রাখবে কি না! চিন্তিত স্বরে বললেন তিনি। তোমার বয়স বাড়িয়ে দিয়ো কিছু।

এসবে তিতিনের কিছু আসেযায় না। স্যার দফতরিকে ডাকলেন, 'ওকে একটা রিকশায় তুলে দিয়ে এসো। বলবে, 'সপ্তবর্ণ' লেডিস হোস্টেলে নামিয়ে দিতে।'

এই বলে কিছুটা দ্বিধা নিয়েই জানতে চাইলেন,

–হোস্টেলের প্রাথমিক খরচটুকু আছে তোমার কাছে?

তিতিন মাথা নাড়ে। স্যার বিদায় দেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তিতিন বেরিয়ে আসে। নাহ! দুনিয়াটা বাঁচার অনুপযুক্ত নয়। কিছু মানুষ অন্যকে বাঁচার সুযোগ করে দেয় বলেই পৃথিবী আজও শূন্য হয়নি!

হোস্টেলে গিয়ে আবার সেই জেরা। কে চায় ঝুঁকি নিতে! শেষ পর্যন্ত যখন বলল, অমুক স্কুল থেকে হেডস্যার পাঠিয়েছেন, তখন মহিলা একটু নরম হলেন। চশমার ওপর দিয়ে তাকাতে তাকাতে ওর বিবরণ এন্ট্রি করলেন। তবে সাথে সাথে সতর্কও করলেন, ওর থেকে সামান্য উল্টোপাল্টা আচরণও বরদাশত করা হবে না। মন খারাপ হয়ে গেল তিতিনের। কিন্তু খুশিও লাগছে। যাক! একটা আশ্রয় তো পাওয়া গেল!

ওর রুম নম্বর ২৪৫। ওখানে আরেকজন মেয়ে থাকে নিশিতা। বড়লোক ঘরের মেয়ে। চালচলনই অন্যরকম। ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এসএসসি পরীক্ষার্থী। বাড়িতে সৎ মা, তাই বাবা হোস্টেলে দিয়ে গেছেন। তবে দেখাশোনায় ত্রুটি করেন না। ওকে দেখেই ভ্রু কুঁচকালো। এমন ময়লা কাপড় পরা, বিধ্বস্ত চেহারার এ কাকে রুমে ঢুকানো হচ্ছে! সরবে আপত্তি জানাল ও।

–নিশিতা, আর কোনো রুমে বেড খালি নেই।

–শুধু এই একটাই খালি তো? আমি দুই সিটের ভাড়া দেব। তবু প্লিজ ওকে আমার সাথে দেবেন না।

–নিশিতা, তুমি এ কী বলছ! মেয়েটি থাকার জায়গা পাচ্ছে না আর...।

সুপারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মেয়েটি আবারও ঝাঁঝিয়ে উঠতে গেল, তিতিনের নীরব স্বরে থেমে গেল,

–আমি তোমাকে কোনো প্রকার বিরক্ত করব না। তোমার সাইডটাতেও যাব না। যদি অন্যথা করি, তুমি ম্যামকে অভিযোগ করে আমাকে বের করে দিতে পার।

এইটুকু মেয়ের মুখে 'তুমি' আর শুদ্ধ উচ্চারণে ঠান্ডা মাথার শব্দগুলো নিশিতাকে চুপ করিয়ে দিল। সে আর কিছু বলল না, তবে মেনেও নিতে পারল না।

তিতিনের আশ্রয় হলো। এবার ওর প্রথম কাজ নিজেকে মানুষ মতো সাজানো। পৈশাচিক সমাজের পৈশাচিকতা ঢাকতে আমরা মানুষেরা পোশাকের প্রতি বেশ যত্নশীল। যেন ওতেই ঢাকা পড়ে যাবে অমানুষের সমস্ত আলামত।

তিতিন ওর ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিল। কিছু কাপড় কিনতে হবে, স্কুলের ইউনিফর্ম বানাতে হবে, উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট্ট মাথায় আর কুলোতে না পেরেই যেন তিতিনের ঘুম পেল। চোখ ভেঙে ঘুম। ও আর পারল না। ওভাবেই শুয়ে পড়ল। ক্লান্তি আর শ্রান্তির অবসানে শরীর যেন স্বস্তি পেল। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও মুহূর্তেই।

যখন ঘুম ভাঙে, তখন সূর্য উঠছে। ঘড়ি বারোটার জানান দিল। দুপুরের খাবার কয়টায় দেবে? পাশের বেডে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে থাকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না, বেরিয়ে এল রুম থেকে। নিচে নেমে দেখল রিসিপশন ডেস্কের পাশে সুপারিনটেনডেন্ট বসে আছেন।

–ম্যাম, লাঞ্চ টাইম কয়টায়?

–কেন?

–একটু বাইরে যেতাম।

–আমাকে তো সকালে জানাওনি।

–ও জানাতে হবে?

–অফকোর্স!

–স্যরি ম্যাম, তা আমার জানা ছিল না।

–এর মানে তোমাকে দেয়া রুলসগুলো তুমি পড়োনি।

জিভ কাটল তিতিন। আসলেই পড়া হয়নি। ওর চোখে, মনে তো এতক্ষণ কেবল

ঘুম ঘুরেছে। উঠে নিজেকে মানুষ করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিল না।

–যেদিন তুমি ক্লাস টাইম ছাড়া অন্য সময়ে বাইরে যাবে, সেদিন সকালেই আমাকে ইনফর্ম করে রাখতে হবে। আমি তোমার গার্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলে ডিসিশন নেব।

–আমার গার্ডিয়ান তো আমিই।

একটা চিন্তার ভাঁজ পড়ল সুপারের কপালে। ঠোঁট কামড়ে বললেন—

–আজকের জন্য যাও। সামনে থেকে আগে জানিও, আমি ভেবে দেখব কী করা যায়।

বেরিয়ে এল তিতিন। পেছন থেকে সুপারের কণ্ঠ পাওয়া গেল, 'দুটোর' আগে ফিরো।

অচেনা পথ, অচেনা মানুষজন। চারদিকে মানুষ গিজগিজ করছে। তবু ওর ভালো লাগছে। সুখ সুখ অনুভূতি হচ্ছে। পাশেই এক ছেলে বস্তা কাঁধে হেঁটে যাচ্ছে, অযথাই ডাকল—

–ওই!

ছেলেটি উদাসীনভাবে ওর দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি নির্লিপ্ত। কী বলবে বুঝে না পেয়ে বিশটা টাকা বাড়িয়ে ধরল ও। ছেলেটি ঘুরে চলে গেল। টাকা নিল না কেন? বিস্মিত তিতিন তাকিয়ে রইল। কিন্তু ওর অবাক হওয়া ঠিক হয়নি। সাইফুলও কারও থেকে অযথা টাকা নিত না, এই অল্প সময়েই তিতিন তা ভুলে গেছে।

হোস্টেলে ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় দুইটা। পেটে মোচড় দিচ্ছে। গরমেও অস্থির লাগছে। আগে গা ঠান্ডা করবে না পেট? ভাবতে ভাবতে নিজের জামায় চোখ পড়তেই তড়িঘড়ি ও গোসলে ঢুকল। এ কাপড়ে কারও সামনে যাওয়া যায় না। নতুন সাবানে গোসল করে সদ্য কেনা জামা গায়ে দিয়ে বের হওয়ার সময়ও একধরনের সুখ অনুভব করল ও। এই টুকরো টুকরো সুখগুলো ওপরতলায় থাকা নিশিতারা বুঝবে না।

হোস্টেলের ডাইনিংয়ে এখানকার সব সদস্যদের দেখা পেল ও। নিজের চশমা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন মেয়েটার নাম সায়েমা। বারবার নাকে হাত দিয়ে চেক করে নিচ্ছে চশমাটা যথাযথ স্থানে আছে কি না। সবার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকা মেয়েটার নাম রেবেকা। আরও আছে হলি, সিনথিয়াসহ অনেকেই। সবার

পরিবারই নানা কারণে দূরে থাকে। তিতিনকে সবাই সুন্দরভাবেই বরণ করল। নিশিতা ছাড়া আর কেউই বাঁকা চোখে তাকাল না ওর দিকে। মারজিয়া মেয়েটা যেচেই গল্প জুড়তে চাইল ওর সঙ্গে। কিন্তু স্বল্পভাষী তিতিনের সঙ্গে জুত করতে না পেরে হতাশ হলো।

তিতিনের দিন ভালো-মন্দ মিলিয়েই যাচ্ছে। ভালোটা এ জন্য যে, ভালো ছাত্রী হিসেবে স্যার-ম্যাডামের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে অল্প দিনেই। মন্দ দুই কারণে—গণিতে ওর অবস্থা জঘন্য; একজন প্রাইভেট টিউটর না হলে চলছেই না। কিন্তু প্রাইভেট টিউটর রাখার মতো অবস্থা ওর নেই। আরেকটা চিন্তা ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে—দ্রুত টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করার ভাবনা ওর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

যত কিছুই হোক, তিতিন ওর আর্টের শখটাকে জিইয়ে রেখেছে। নিশিতার রাত জাগার অভ্যাস। রাত জেগে পড়াশোনা করে। আর তিতিন রাত জেগে রং-তুলির আঁচড়ে দীর্ঘশ্বাসের নামতা গোনে। প্রথম প্রথম মুখ বাঁকাত নিশিতা। ক্যানভাসটা যত পূর্ণতা পাচ্ছে, নিশিতার দৃষ্টি তত নরম হচ্ছে।

পাশাপাশি চলছে ওর একটু একটু দ্বীনচর্চা, পথিক ও দারোয়ান চাচা মিলে দ্বীনের যে বীজ বপন করেছিলেন—তার একটু একটু পরিচর্যা। সস্তা গল্পের বইগুলো ওকে টানে না। কাঠখোট্টা ইসলামী বইগুলোতেই ও খুঁজে পায় জীবনের স্বাদ। সবাই ঘুমিয়ে গেলে ওর মনে প্রশান্তি আনে আবু তাহের মিসবাহর শিশু সীরাত সিরিজের সুশীতল পথের বর্ণনা। লেখকের সাথে মাক্কাহ্, মাদীনার ধূলি গায়ে মাখে আর নাকের পানি চোখের পানি একাকার হয়ে বন্ধুত্ব করে বালিশের সাথে।

এভাবে কেটে গেল আরও কিছু দিন। ফার্স্ট টার্ম পেরিয়ে সেকেন্ড টার্ম দ্বারপ্রান্তে। ওদিকে তিতিনের অবস্থা যেই কে সেই। প্রিন্সিপ্যাল স্যার সতর্ক করেছেন, এই টার্মেও গণিতে ফেল করলে সামনের বছর এই ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে। টাকার চিন্তা সরিয়ে রেখে তিতিন এখন একজন টিউটর খুঁজছে। কিন্তু কে ওকে পড়াবে? একজন গার্ডিয়ান না থাকার অসহায়ত্ব খুব প্রকটভাবে অনুভব করছে ও। কী করবে?

অভিভাবকহীন, বন্ধুহীন তিতিনের জীবনের মতো মনটাও এলোমেলো হয়ে যায় মাঝে মাঝেই। শত কথা, অব্যক্ত আকুলতা ঝটপট করে ওঠে প্রায়শই। কিন্তু ওর বলার জায়গা কই? এখানে কত মেয়ে, কিন্তু ওর দুটো কথা বলার মানুষ নেই। জীবন ওকে বিশ্বাসহীনতা শিখিয়েছে, কথা বলার শক্তি কেড়ে নিয়েছে; অথচ বলার মতো অনেক উপলক্ষ্য দিয়েছে। কী অদ্ভুত এ জগৎ-সংসার!

মনের গহিন কোণটায় ও অনুভব করে, ওর একটা আশ্রয় চাই; চাই সবকিছু বলতে পারার মতো বন্ধু। কিছু শব্দ চাই—বাতাসে রিনরিন করে যে শব্দগুলো উড়িয়ে নেবে বুকের হাহাকার; কিছু অশ্রু চাই—যে অশ্রুর প্রবাহে ভেসে যাবে হৃদয়ের কালচে রক্ত।

হঠাৎ এক আলো উঁকি দিল ওর মনের ছোট্ট কোণে। কার্নিশ থেকে ব্যাগটা নামাল। চেইন খুলে কী ভেবে আবার লাগিয়ে দিল। নাহ! নিশিতাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না! ও রং-তুলি নিয়ে বসে গেল। আজকে ও ক্যানভাসটা শেষ করবে। পাশেই পড়তে থাকা নিশিতা টেরও পেল না, কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে এই ছোট্ট মেয়েটার মনের বন্দরে।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে. সাথে চলছে তিতিনের হাত। একসময় ডাইনিংয়ের ঘড়িটা তিনটার জানান দিল। হাই তুলল তিতিন। নাহ্, আর চলছে না। সবকিছু গুছিয়ে বিছানায় পিঠ এলিয়ে দিল। চোখ লাগতে দেরি হলো না। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছে তিতিন, মনে হচ্ছে যেন গভীর কোনো খাদে পড়ে যাচ্ছে, পড়ছে... পড়ছে... হঠাৎ এক চিৎকার ওকে গর্তের অতলে যেতে দিল না।

-প্লিজ! বাবা!

চমকে উঠে তিনি দেখল ঘুমের মধ্যে বড্ড ছটফট করছে নিশিতা।

-নিশিতা, এই নিশিতা!

ওর ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল নিশিতা।

-কী?

-কিছু না। তুমি ঘুমের মধ্যে কষ্ট পাচ্ছিলে, তাই ডেকে দিলাম।

নিশিতা কিছু না বলেই আবার শুয়ে পড়ল। তিতিনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল, কিন্তু এখন আর ঘুম এল না; বরং জোর করে ঘুমানোর চেষ্টা করতে গিয়ে মাথার একদিকের শিরা দপদপ করতে লাগল। উঠে পড়ল ও, রুমের জানালা দিয়ে

তাকাল। ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন আলোয় শহরটাকে বড় বেশি নিষ্পাপ মনে হয়। এ নিষ্পাপ চেহারা নিয়েই কত শত পাপ লুকিয়ে চলেছে এ আপাত নিঝুম নগরী!

একদল কুকুর ছুটে গেল। শহরের আকাশে চাঁদ নেই। বিশাল কালো ছায়া বুকে এক হাহাকারের জন্ম দেয়। জানালার ধার থেকে সরে এল তিতিন। রাতের মৃদু বাতাস কখন যে ওর চোখ ভিজিয়ে দিয়ে গেছে তা নিজেই জানে না। মনের ভেতর থেকে এক আকস্মিক তাগাদায় ও ব্যাগটা খুলল। বের করল প্রথম দিন অন্যান্য কেনাকাটার সাথে কেনা একটা জায়নামায।

জানালার ওপারে ঝিরিঝিরি বাতাস, এক শূন্যতা; এপারে এক কিশোরী, হৃদয়ে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। ঘরজুড়ে আঁধার, নিরাশার দোলাচল; কিশোরীর মনে আলোর রেখা, কথার কোলাহল।

অনেক দিন পর তিতিনের চোখে জল এল; এতদিনের না-আসা জল গলগলিয়ে চোখের দরজা বেয়ে পড়তে লাগল। এত এত কথা বলতে গিয়ে ভেজা গলায় কথা জড়িয়ে এল। ও চুপ করে গেল। শুরু হলো মনে মনে বলা; যাঁকে বলছে তিনি তো অন্তর্যামী! নাই-বা থাকল শব্দ, শব্দহীন ভাষার তিনিই তো শ্রেষ্ঠতর শ্রোতা!

আইদার ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তাওফীকা। স্রষ্টাকে নতুন করে চিনতে পারার এক দ্যুতি তার চোখে-মুখে লেপটে আছে।

-তখন থেকে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা শুরু, চেষ্টা ছিল সবটা মানারও। কিন্তু... এক দীর্ঘশ্বাসে উড়ে গেল তাওফীকা হাসানের বাকি শব্দমালা। জীবনের এত চড়াইউতরাই যাকে পেরুতে হয়েছে একা, তার জন্য সবটা মানা কতটা দুষ্কর তা আইদা খুব ভালোভাবেই জানে।

-তারপরও চেষ্টা করেছি, আঁচলে যতটুকু নিয়ম-কানুন মেনে চলা যায়।

তবে তিনি যে দ্বীনের খুব কম অংশই ছেড়েছেন, তা বোঝা যায় আঁচলের নিয়ম-কানুন থেকেই। প্রায় সবগুলো নিয়মেই কৌশলের সাথে রক্ষা করা হয়েছে ইসলামের বিধিবিধান। আইদা ভাবত, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই আঁচলে এসব নিয়ম রাখা হয়েছে। এর পেছনে যে ধর্মপ্রেম থাকতে পারে, তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। তাওফীকা আবার কথা বলে উঠলেন—

–আমরা দ্বীনটাকে খুব হেলাফেলার বিষয় ভাবি। কথিত সুশীলদের ধারণা, গেঁয়ো কিছু ভূত, যাদের নিজস্ব স্বকীয়তাবোধ বলতে কিছু নেই তারাই চলার জন্য ধর্মকে সামনে টেনে আনে। অন্য সব ধর্মকে এড়িয়ে ইসলাম যেন তাদেও চক্ষুশূল হয়ে আছে।

আইদার দৃষ্টিটা কেমন হয়ে গেল। সব ধর্মের অনুসারীদের সেবায় নিবেদিত এ মানুষটির মাঝে আবার চরম সাম্প্রদায়িকতা! ম্যামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের টানাপোড়েন অনুভব করল আইদা। তাওফীকার দৃষ্টিও খুঁজে পেল আইদার দৃষ্টির এ পরিবর্তন। চোখে মুখে খেলে গেল এক হাসি।

–ভাবছ এ কেমন সাম্প্রদায়িকতা?

–সাম্প্রদায়িকরাই তো এমন বলে, না? শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতিটুকু আইদার প্রশ্নের সুরেও ধরা পড়ল।

–তুমি কি জানো অসাম্প্রদায়িকতার স্লোগানই সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়? যখন স্লোগান ওঠে, 'অসাম্প্রদায়িক, ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ চাই; তখনই কিন্তু মনে জাগে, এর মানে সম্প্রদায়ের ভিন্নতা, ধর্মীয় বিভেদ বলে একটা বিষয় আছে। ইসলামে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। কিন্তু কেবল ইসলামেই অন্য ধর্মাবলম্বীরাও নিরাপদ। কারণ, ইসলাম তাদের মানুষ মনে করে। মানবতাবোধের সর্বোচ্চ দীক্ষা আছে এ ইসলামেই। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, সব ধর্মের লোকদের সাথেই উত্তম আচরণ করতে, তাদের সামনে নরম ভাষায় সত্য তুলে ধরতে।

সাহাবী আবূ হুরাইরা রা. এর মা ছিলেন কাফের। অথচ মায়ের সাথে না তিনি কখনো খারাপ আচরণ করেছেন আর না খারাপ আচরণের অনুমতি ছিল। ইসলামের ইতিহাস পড়লেই তুমি দেখতে পাবে, ভিনধর্মের লোকদের সাথে কতটা সুন্দর ছিল ইসলামী দেশ-বিজেতার আচরণ। এ সুন্দর আচার-ব্যবহার আর ইনসাফের জোরেই ছড়িয়েছে ইসলাম। ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত নম্র ব্যবহার নির্দেশ দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইসলামের সামনে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

এ ছাড়াও দেখো, একজন মুসলিমকে দান করলে যেমন রয়েছে পুণ্য, তেমনি একজন অমুসলিমকে দানের মাঝেও রয়েছে একই প্রতিদান। (তবে তাদের যাকাত দেয়া যাবে না; বরং নফল সাদকাহ্ দেবে।) কোনো মুসলিমের ওপর অস্ত্র তুলে ধরার আগ পর্যন্ত কিংবা নবি, রাসূল বা ইসলামকে নিয়ে কটূক্তির আগ পর্যন্ত কোনো

বিধর্মীর সাথে বিরূপ সামাজিক আচারের কোনো সুযোগ নেই ইসলামে। এমনকি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বাস ছিল ইহুদীদেরও, তাদের সাথে তাঁর সামাজিক আচার ছিল এতটাই স্বাভাবিক যে, সম্ভবত ওফাতের পরও তাঁর কোনো বর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক দেয়া ছিল। তবে কেন ধর্মনিরপেক্ষতা আর অসাম্প্রদায়িকতার স্লোগান? সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই বরং আমি খুঁজে পেয়েছি অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম পালনের মাঝেই আমি দেখেছি সর্বোত্তম মানবতা।

আইদা হা করে গিলছিল। কোথায় আঁচলের চেয়ারপার্সন আর কোথায় আজকের এই ধর্ম-পর্যালোচক! তাওফীকাকে যেন কথার নেশায় পেয়েছে—

–আমি মুসলিম। কোনো যুক্তি ও প্রমাণের পিছু না ছুটেই আমি মুসলিম। আল্লাহ্ যা যা বলেছেন, আমি আল্লাহর কথায় বিশ্বাসী। যুক্তি-প্রমাণের পর বিশ্বাস করা তো নিছক নিজের বিবেককে বড় করে দেখা, বস্তুত না দেখে আল্লাহর কথায় অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করার নামই ঈমান। আমি ছোট্ট একটা বিষয় বলি দেখো, আস্তিক হওয়ার একটা সুবিধা আছে। আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন, ধরো তুমি বিশ্বাস করো, স্রষ্টা বলে কিছু নেই, নেই হাশর বা হিসাব-নিকাশের চিন্তা, পরকালে অন্যায় কাজের শাস্তির ভীতি। তাহলে মৃত্যুর পর তোমার কী হবে? কিছুই না। কারণ, মৃত্যুর পরে যদি কোনো জগৎ না থাকে, তাহলে তোমার আস্তিকতায় বা নাস্তিকতায় কিছু যায় আসে না।

কিন্তু ধরো তুমি অবিশ্বাসী আর স্রষ্টা, পরকাল বলে কিছু আছে। তাহলে তোমার উপায় কী হবে!

আরও একটা বিষয় দেখো! আস্তিক স্রষ্টার ভয়ে হলেও অনেক কাজ থেকে বিরত থাকে। কারণ, পরকালে তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু একজন নাস্তিকের সে দায় নেই। তাহলে তার থেকে নৈতিকতাই-বা আশা করি কী করে...?

কথা বলেই যাচ্ছেন, বলেই যাচ্ছেন তাওফীকা। লম্বা একটা সময় পর তার যেন মনে হলো যে, একজন শ্রোতা সামনে আছে, তারও বিরক্তি বলে কোনো অনুভূতি থাকতে পারে। হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন,

–তুমি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছ। চলো নিচে নামি।

–না, ম্যাম; বরং নতুন অনেক কিছু জানছি। আইদার সুরে সেই শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতিটুকু আর টের পাওয়া গেল না নাকি তাওফীকা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন

না, তা নিজেও বুঝলেন না।

সবকিছু নিয়ে নিচে নেমে এল দুজন। রাতটা দোতলায় কাটানো হবে বলে আগেই কথা হয়েছে দুজনের মাঝে। দোতলায় নেমে হাতে থাকা শক্তিশালী চার্জার লাইট জ্বাললেন তাওফীকা।

মোট চারটা রুম এ তলায়। এর মাঝে একটা সেই স্টোর রুম। বাকি তিন রুমে যাওয়া হয়নি এখনো। মাঝে বিশাল এক করিডোর। একদম কোনায় কোনো এককালে ফুলের বাস ছিল, আধভাঙা ফুলদানিটা এখনো সে ফুলের কঙ্কাল বয়ে বেড়াচ্ছে। দুটো রুমের দরজাগুলো আধখোলা হয়ে আছে। একটা দরজা বন্ধ। সে বন্ধ দরজাটার দিকে প্রথমে এগিয়ে গেলেন তাওফীকা। ধাক্কা দিলেন, খুলল না। আবার... উঁহু। দুজনে মিলে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা দিলেন শেষবারের মত। নাহ্! আঁচলের হর্তাকর্তারা এক দরজার কাছে পরাজিত হয়ে গেল।

এর পরের রুমটায় গেলেন তাওফীকা। মাকড়সার ঝুল সরিয়ে রুমে পা রাখলেন। খুব আহামরি নয় রুমখানা। আইদার মনে হলো, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু খুঁজছেন তাওফীকা। সেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ধীরে ধীরে জলে পূর্ণ হয়ে উঠল। স্বচ্ছ গভীর জলে যেমন মাছদের খুব হুটোপুটি ভেসে ওঠে, তাওফীকার চোখে তেমনি অব্যক্ত বেদনারা ডানা ঝাপটে উঠল।

–জানো আইদা, ধরা গলায় বললেন তাওফীকা।

–জি, আপু?

–আমার মা এ ঘরেই সুইসাইড করেছিলেন।

–কীহ্! আইদা কি ভুল শুনল?

–আসলেই তা-ই। পাশের রুমটা বাবার। কাগজপত্রে বাড়িটা এখন আমার। যদিও ছোটবেলায় বাড়ি ছাড়ার পর এই আজ আসলাম। অনেক বছর পর...।

কথাটা হজম করতে আইদার সময় লাগল। এ জন্যই ম্যাম এভাবে মুখস্থ বলতে পারছেন সব!

তাওফীকার চোখ তখন এখানে নেই, চলে গেছে অতীতে। তার জীবনের গল্পে।

তিতিনের রুমমেট আত্মহত্যা করেছিল। দুই দিন পর নিশিতার বাবা দেখা করতে এসেছিলেন। কী কথা হয়েছিল তিতিন জানে না। কিন্তু এরপর থেকেই মেয়েটাকে কেমন মলিন মুখে দেখত। মাঝে মাঝে ভান পড়ার ছলে টেবিলে বসে কাঁদতো। তিতিন বুঝত, কিন্তু কিছু জানতে চাইত না। এক রুমে থেকেও ওদের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব। ও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'শ্রেণিভেদে'র কাছে কতটা অসহায় মনুষ্যত্ব!

এরই মাঝে শুরু হলো এসএসসি পরীক্ষা। নিশিতা রাত জেগে পড়ছে। যাকে বলে নাকে-মুখ গুঁজে পড়া। কোনো দিকের হুঁশ ওর নেই পড়া ছাড়া। গল্পের বই পড়াও বন্ধ। তিতিন দেখে আর হাঁপিয়ে ওঠে। আবার ভাবে, সেও যদি পারত এভাবে পড়তে!

পরীক্ষা শেষে ওদের হোস্টেলে এক ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। যাদের পরীক্ষা শেষ তারা হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবে। দু-হাজার করে চাঁদা তোলা হলো। তিতিন না চাইলে কী হবে? ওকেও দিতে হলো।

ওর কাছে তখন প্রতিটি পয়সা মহামূল্যবান। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অর্থ আসার কোনো পথ খুলছে না। মনের কোণে সব সময় এ চিন্তাটা ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। কখনো ভাবনা জাগে, কখনো রাগ ওঠে—আজ সাইফুল থাকলে কোনো-না-কোনো উপায় ও বের করে দিতই! অথচ সাইফুলের তো জানারই কথা না ও কোথায় আছে!

অনুষ্ঠানের একদিন আগে। তিতিন ওর টেবিলে বসে অঙ্ক নিয়ে গলদঘর্ম। কানের কাছে 'তাওফীকা!' শুনে লাফিয়ে উঠল। নিশিতার হাসি শুনে তারচেয়ে বেশি অবাক হলো,

–কী, পারছ না? এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিতিন যন্ত্রচালিতের মতো খাতা-কলম বাড়িয়ে দিল, কিন্তু অঙ্কে ঠিক মনোযোগ দিল এবং অবাক হলো, নিশিতার ব্রেইন অসম্ভব রকমের ভালো। এত কঠিন অঙ্ক এত সহজে ও বুঝিয়ে দিল যে, ও ভাবতে বাধ্য—অঙ্ক এত সহজ!

আরও দুইটা অঙ্ক বোঝানোর পর তিতিনই বলল, 'আজ থাক। যদি পারেন,

তাহলে অন্য আরেকদিন..'

-আরেকদিন আর কবে। পরশুই তো আমরা চলে যাচ্ছি।

তিতিনের মুখটা আবার মলিন হয়ে গেল। ভেবেছিল, নিশিতাকে কিছু দিয়ে হলেও রিকুয়েস্ট করবে, ওর অঙ্কের কান্ডারি হতে! পরশু ফেয়ারওয়েলের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। ওর মলিন মুখ দেখে আবার বলে উঠল নিশিতা,

-তবে আমি একজনকে জানি যে খুব ভালো অঙ্ক পারে। আমি বললে ও তোমাকে হেল্প করবে। কিন্তু আমাকে এর বিনিময় দিতে হবে একটা!

কী চাই নিশিতার? তিতিন পারলে নিজেকেই বিলিয়ে দেয় খুশিতে। ওর চোখ চিকচিক করে ওঠে—

-কী, বলেন!

-পরশু ফেয়ারওয়েলে আমার এ কবিতাটা আবৃত্তি করতে হবে তোমাকে!

চুপসে গেল তিতিন। কখনো আবৃত্তি করেনি ও। আমতা আমতা করলেও নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই রাজি হয়ে গেল ও। আবৃত্তি খারাপ হলে বড়জোর সবাই হাসাহাসিই না হয় করবে, কিন্তু বিনিময়ে ও যে আরও বড় কিছু পাচ্ছে।

অল্প সময়েই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ওরা। তিতিন বুঝল, কোনো মানুষের ঘনিষ্ঠ না হয়ে তাকে মূল্যায়ন করা উচিত না। অনেক সময় মানুষ যা দেখে, তা সত্য হয় না; আর যা সত্য, তা দেখতে পায় না। নিশিতা ওকে থার্ডক্লাস ভেবে এড়িয়ে যায়নি; বরং ও একাকিত্ব পছন্দ করে। অমিশুক নিশিতার মাঝে কাজ করে প্রচণ্ড হতাশা। ওর বাবার ইচ্ছা, ওকে মেডিকেলে চান্স পেতেই হবে। তার আগে এসএসসিতে গোল্ডেন তুলতেই হবে। এ জন্য তিনি সব করতে রাজি। অপর দিকে নিশিতা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায়। মেডিকেলের প্রতি ওর কোনো উৎসাহই নেই। তা ছাড়া ওর এসএসসির রেজাল্ট বোধহয় তত ভালো হবে না, বাংলায় তো ফুল মার্কের আন্সারই দিতে পারেনি। সব মিলিয়ে খুব টেনশনে যাচ্ছে ওর দিন।

পরদিন কথা অনুযায়ী নিশিতা এক মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। কার্টুনের মতো চিকন নাকের ওপর ইয়া মোটা গোল কাচের চশমা পরা মেয়েটির নাম নায়লা। এইটের ছাত্রী। এই হোস্টেলে ও আছে প্রায় বছর তিনেক। বাড়ি পাবনা। কথা বলার ভঙ্গি বেশ সুন্দর। তিতিন ভেবেই পেল না, নায়লাকে রেখে নিশিতা ওকে কেন আবৃত্তির জন্য অনুরোধ করল। তবে একটু পর বুঝল, মেয়েটার ভয়েস

অনেক ছোট। আবৃত্তির জন্য উঁচু স্বর চাই। দ্বিধা করে অবশেষে জিজ্ঞেস করেই বসল তিতিন,

–ইয়ে! মানে কত... কী দিতে হবে?..

নিশিতা আর নায়লা দুজনেই হেসে উঠল ওর কথায়। লজ্জা পেয়ে তিতিন চুপ হয়ে গেল। নিশিতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল। অনেক বড় এক খরচ থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিল নিশিতা। এরপর থেকে নায়লার কাছে প্রায়ই যেত ও। কখনো নায়লাও আসত। এভাবে তাদের মাঝে একধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। সে বন্ধুত্ব যে ওদের ভবিষ্যৎ জীবন এক সুতোয় বেঁধে দেবে কে জানত!

হলরুমটা কানায় কানায় পূর্ণ। স্টেজে উঠতে গিয়ে তিতিনের গা কাঁপতে লাগল। ধীরে ধীরে ওর স্বরে উচ্চারিত হলো—

'ওহে!
ওহে, পৃথিবীর সন্তানেরা!
ক্যারিয়ার আর বিলাসিতার পেছনে তো অনেক ছুটেছ!
এবার একটু থামো!
আমার কচি স্বরের মিনতি শোনো!
অনুচ্চারিত কিছু শব্দের দীর্ঘশ্বাস শোনো!
আমরা বাঁচি
কেন বাঁচি বলতে পার?
বাঁচার আনন্দে বাঁচি কয়জন
তা কি জানো?
কত চাওয়ার বোঝা নিয়ে
এই যে তুমি, হ্যাঁ তুমি!
একেবারে নুয়ে নুয়ে
ঘামের দামে রক্ত বেচে
দিনমান ছুটে চলেছ,
পেয়েছ কি কোনো চাওয়া?
ছুঁতে পেরেছ প্রত্যাশা?

তবে কেন?
কেন এত প্রত্যাশা আমাদের?
আমি যদি কখনো সাহস করি,
কাউকে হত্যা করার
হত্যা করে ভুলে যাওয়ার
তবে তা ওই প্রত্যাশা।
আমি বাঁচতে চাই বাঁচার আনন্দে
প্রত্যাশাকে হারিয়ে।
স্বাধীন পাখির মতো
দুলতে থাকা ঝিঙে ফুলের মতো
আমি আমার জীবনকেও উড়াতে চাই!
শত রঙে দোলাতে চাই!
কিন্তু জানি,
পৃথিবী নিয়ম ভাঙবে না
প্রত্যাশাও পিছু ছাড়বে না।
তবু আমি লড়ে যাব
হয়তো আমি হেরে যাব
কিন্তু পৃথিবীকেও জিততে দেব না।

নিশিতা চলে গেল। তিতিন আর নায়লা রয়ে গেল। অল্প ক'দিন পরেই ওরা জানতে পারল, নিশিতা আত্মহত্যা করেছে। কেন করেছে তা কেউ না জানলেও ওরা ঠিক জানে। বাবা আর নিজের মন—দুইয়ের প্রত্যাশার চাপে হেরে গেছে নিশিতা। কিন্তু পৃথিবীকেও জিততে দেয়নি, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলে গেছে। আসলেই কি দেয়নি? ও মরে যাওয়ায় কার কী ক্ষতিটা হয়েছে? বরং সবাই সহানুভূতি দেখাচ্ছে। মেয়েটা টিকে যেতে পারেনি পৃথিবীর বুকে। তবে তো হেরেই গেল, পৃথবী জিতে গেল। বরঞ্চ ও যদি সব স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নিজের সঠিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, তবেই না ওর জয় হতো! এই প্রথম তিতিন উপলব্ধি করল, আত্মহত্যা মানে পরাজয়! তার মা জীবনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন!!

জীবনের অনেক উত্থানপতনের মাঝ দিয়ে তিতিন এখন অনার্সে, ইডেন কলেজে সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে পড়ছে। নায়লা পড়ছে জগন্নাথে ফিলোসফি নিয়ে। কিন্তু তবু ওরা দুয়ে মিলে এক প্রাণ। তিতিন এখন বড়। তার চিন্তার পরিধিও বেড়েছে। বেড়েছে কাজের ক্ষমতা। জীবন থেকে পাওয়া দীক্ষা আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ওর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বেছে নিতে সহায়ক হলো। একটু একটু করে ও ঈপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়েও যাচ্ছে। নায়লা আর ও পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে ছোট্ট একটা গ্রুপ করেছে আত্মহত্যা রোধের লক্ষ্য নিয়ে। এর আগে ও বিষয়টা নিয়ে প্রচুর স্টাডি করেছে।

আত্মহত্যা বা আত্মহনন (suicide) হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। ল্যাটিন ভাষায় সুই সেইডেয়ার থেকে সুইসাইড শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা।

প্রায় ৯০% ক্ষেত্রে আত্মহত্যার সাথে মানসিক অসুস্থতার একটা সম্পর্ক থাকে। এশিয়ার দেশগুলোতে মানসিক রোগের হার পশ্চিমা দেশের চেয়ে অনেক কম।

আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র রোগের আবির্ভাব ঘটতে পারে, যাকে ব্যক্তিত্বের ব্যাধি হিসাবে দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তরুণ, যুবা বা ভার্সিটির ছাত্ররা এ সমস্যায় ভুগে থাকে।

এক রিপোর্টে দেখা গেছে, সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ৫% মানুষ আত্মহত্যা করেন।

অধিক খাবার খাওয়াও আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

আত্মহত্যাকারীদের প্রায় ৮০% মৃত্যুর আগে এক বছরের মধ্যে ডাক্তার দেখিয়েছেন, প্রায় ২৫–৪০% আগের বছর মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছেন। SSRI টাইপের অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট শিশুদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

তিতিন পড়ে আর অবাক হয়। তিতিন নানা সময় দেখেছে, ব্যক্তিত্বেও সমস্যা বা চাকরি থেকে হতাশার কারণে অনেক মেধা ঝরে যাচ্ছে অবলীলায়। রাষ্ট্র কেন এ

বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না সেটা ভেবেও বিস্মিত হয় ও। তবে সেদিন পত্রিকায় পড়েছে বিশ্বে প্রথমবারের মতো ব্রিটেনে আত্মহত্যা প্রতিরোধের জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

এসব পড়াশোনার পর মোটা দাগে কয়েকটি বিষয় ধরা পড়েছে ওর কাছে :

আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে সিংহভাগই উঠতি বয়সের। তার পরেই আছে শিক্ষিত তরুণ, যুবারা।

তাদের অধিকাংশই হতাশা থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও হতাশার ধরন ভিন্ন। কারও পড়াশোনা নিয়ে হতাশা, কারও চাকরি নিয়ে, কারও সন্তানাদি নিয়ে। হতাশা ছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে অভাবের তাড়না, অবৈধ সম্পর্কের লজ্জা, প্রচণ্ড রাগ–জিদ–অভিমান।

অধিকাংশই আত্মহত্যার আগে সংকেত দেয়। যেমন, বারবার মরে যাওয়ার কথা বলা, বাঁচতে ইচ্ছে করে না ধরনের আলাপে আগ্রহী হওয়া, হঠাৎই খুব বেশি আনন্দে দিন কাটানো। কখনো কাছের মানুষগুলো ধারণাও করতে পারে অস্বাভাবিক কিছু হচ্ছে। কিন্তু তাতে লাভ হয় না।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে কিছু টিপসও দাঁড় করায় ও :

* যদি কেউ লিখিত বা মৌখিকভাবে কখনো আত্মহত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।
* যেকোনো কারণে চরম হতাশাগ্রস্ত একজন ব্যক্তি আত্মহত্যার ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। কাজেই হতাশাগ্রস্তদের উৎসাহ জোগাতে হবে।
* অতীতে এক বা একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টার ইতিহাস আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় অনেক গুণ। গবেষণায় দেখা গেছে ৪০–৬০ শতাংশ আত্মহত্যাকারীরই অতীতে এক বা একাধিকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। এ সমস্ত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। কখনো একা ছেড়ে দেয়া যাবে না।
* হঠাৎ করে কোনো ব্যক্তি, যদি নিজেকে সমাজ থেকে, সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তার প্রতিটি কর্মকাণ্ড গভীরভাবে লক্ষ করতে হবে।

আত্মহত্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে তিতিন ইসলামের মাহাত্ম্য অনুধাবন করে আরও বিস্মিত হয়। এহেন মন্দ কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য ইসলাম আরোপ করেছে প্রচণ্ড কাঠিন্য। আল্লাহ বলেন,

'আর তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। এবং যে কেউ জুলুম করে, অন্যায়ভাবে তা (আত্মহত্যা) করবে, অবশ্যই আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব, আল্লাহর পক্ষে তা সহজসাধ্য।[২]

কেন এত কাঠিন্য? কারণ, প্রাণ যে মানুষের মালিকানাধীন না! এ প্রাণের স্রষ্টাও যে আল্লাহ। কাজেই এ প্রাণ নেয়ার অধিকারও কেবল তাঁর। মানুষের হতে পারে না। তাই তো তিনি বলেন,

'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।[৩]

আবূ হুরায়রা রা. রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে দোজখে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শার আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে দোজখেও সে সেভাবে নিজেকে শাস্তি দিতে থাকবে। আর যে নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে নিজেকে ওপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে থাকবে।[৪]

শুধু আত্মহত্যাকে মন্দ বলেই ইসলাম থেমে যায়নি ; বরং এ প্রবণতা রোধের সুন্দরতম সমাধানগুলোও এতে আছে।

আপনি হতাশ? আল্লাহ্ বলেন, 'বলো,

'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'[৫]

আপনি কষ্টে আছেন? শুনুন তাঁর অভয়,

তারপর আমি মন্দ অবস্থাকে ভালো অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্য লাভ করেছে এবং বলেছে, আমাদের বাপ-দাদাদেরও দুর্দশা ও আনন্দ স্পর্শ করেছে।[৬]

এভাবেই সব... সব ক্ষেত্রে ইসলাম এত সুন্দর শিক্ষা রেখেছে যে, ইসলামের সঠিক চর্চা আত্মহত্যার প্রবণতা কমিয়ে দেয় বহুগুণে। এর প্রমাণ আছে পরিসংখ্যানেও।

---

[২] সূরা আন-নিসা : ২৯-৩০
[৩] সূরা ইউনুস : ৫৬
[৪] সহীহ ইবন হিব্বান : ৫৯৮৭; তাবরানী : ৬২১
[৫] সূরা আয-যুমার : ৫২
[৬] সূরা আল-আরাফ : ৯৫

পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবগুলো কম্যুনিস্ট অধ্যুষিত দেশসহ বৌদ্ধ ও উন্নত বিশ্বের সেক্যুলার দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। আত্মহত্যাপ্রবণ প্রথম পঞ্চাশটি দেশের মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত একটিমাত্র দেশ আছে। প্রথম পঁচাত্তরটি দেশের মধ্যে মাত্র চারটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আছে। দেশগুলো হচ্ছে কাজাখিস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ও উজবেকিস্তান।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই চারটি দেশই কম্যুনিস্ট শাষিত সোভিয়েত রাশিয়ার অধীনে ছিল। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় এই দেশগুলোও স্বাধীন হয়। তার মানে দেশগুলো হয়তো কম্যুনিজমের বস্তুবাদী প্রভাব থেকে আজও সেভাবে মুক্ত হতে পারেনি।

অধিকন্তু দেশ চারটি মুসলিম অধ্যুষিত হলেও মুসলিমদের আত্মহত্যার শতকরা হার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো অত বেশি না।

যেদিন থেকে তিতিন আত্মহত্যা নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে, সেদিন এ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সে টুকে রাখে। আত্মহত্যা এক মহামারির রূপ ধারণ করেছে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা। ২০১৮ সালে পড়া এক পরিসংখ্যানের কথা ওর মনে পড়ছে—

প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বিশ্বের কোথাও-না-কোথাও কেউ-না-কেউ আত্মহত্যা করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে বিশ্বে আত্মহত্যা করেছে ৮ লাখ মানুষ। এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১১ সালে ৯ হাজার ৬৪২ জন, ২০১২ সালে ১০ হাজার ১০৮, ২০১৩ সালে ১৬ হাজার ২৮৮, ২০১৪ সালে ১৬ হাজার ৭১৭ এবং ২০১৫ সালে ১৭ হাজার ৬২৩ জন আত্মহত্যা করেছে। দ্য ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদন বলছে যে, বাংলাদেশে ২০০২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৭৩ হাজার ৩৮৯ জন আত্মহত্যা করে।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৪ বছরে ২৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের ১১ জনই আত্মহত্যা করেছেন গত তিন বছরে। ২০১৭ সালে তিন জন এবং গত বছর সাত জনের আত্মহননের ঘটনা ঘটেছে।

২০১৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ফিন্যান্স বিভাগের এক ছাত্র একটি ভবনের

ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সহপাঠীরা জানান, পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি হতাশায় ভুগছিলেন।

পরের মাসেই এমবিএর এক ছাত্র তার অ্যাকাডেমিক ভবনের ৯ তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

এসব স্টাডির কথা মনে পড়তেই সেদিনের তিতিন আজ আবারও মর্মে মর্মে অনুভব করল, কী ভুল ভাবনা নিয়ে সে বড় হচ্ছিল! মানুষ জীবনের কাছে যখন হেরে যায়, তখনই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। অলস আর নির্বোধরাই আত্মহত্যার নাম করে পালিয়ে যায় কাপুরুষের মতো। এরা তো মরার আগে বহুবার মরে!

ধর্মও অসম্ভব রকম অপছন্দ করে এ কাজকে। কী কঠিন হুঁশিয়ারি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে!

সুইসাইড পরবর্তী সময়গুলোও ও লক্ষ করেছে আগ্রহ নিয়ে। দেখেছে কাছের মানুষগুলোর তড়পানি, শত্রুদের স্মিত হাসি। নিজেকেই শুধায় ও, আত্মহত্যার পর মানুষ কতটা অসহায় পড়ে, না? পুলিশেরা কতটা অযত্নে লাশ টানাহেঁচড়া করে, ময়নাতদন্তের নামে যথেচ্ছা কাটাকাটি করে, নিতান্ত অবহেলাভরে দাফন করে। একটা মানুষের আত্মহত্যা জীবিত অনেক মানুষের হয়রানির কারণও হয় বটে!

সেদিন এক কেইসে দেখেছে, এক ছাত্রীর আত্মহত্যার দায় চেপেছে তারই এক ম্যাডামের ওপর। অপরাধ, তিনি সেদিন ছাত্রীটিকে বকেছিলেন। তিন মাস পর তিনি বেরিয়ে আসেন ভীতিপ্রদ সেই লাল দালান থেকে। কিন্তু হারিয়ে গিয়েছিল তার বাকশক্তি। ভেঙে গিয়েছিল তার আসন্ন বিয়ে।

তিতিন এসব পড়ে, শোনে, জানে আর ভাবে, আত্মহত্যাটাও এখন এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ছোট্টবেলায় অপরিচিত সে লোকটি তাকে এমনি এমনি থাপ্পড় দেয়নি। এখনকার প্রজন্ম উগ্র এক প্রজন্ম। কিছু বুঝতে চায় না, সইতে চায় না, ইচ্ছে স্বাধীন জীবন চাওয়া এ প্রজন্মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হলেই তারা ঝুলে পড়তে চায়। ভাবে না, এর কী পরিণতি! এটা কত বড় লাঞ্ছনা!

এ নিয়ে সোচ্চার হওয়ার, এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার দায় থেকে হোক কিংবা ছোটবেলায় অজান্তে করতে চাওয়া অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে, ও এ ক্ষেত্রটিকেই বেছে নিয়েছিল কাজের জন্য।

প্রথমে ছোট পরিসরে কাজ শুরু করেছিল ওরা, নায়লার ভার্সিটি আর নিজের

কলেজে দুটো গ্রুপ করার মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য হলো আত্মহত্যাপ্রবণ ছেলে-মেয়েদের চিহ্নিত করা, এরপর কাউন্সিলিং করা। তারা এ সংগঠনের নাম দিল, 'এসো বাঁচি'। ওদের প্রথম ক্লায়েন্ট ছিল রাইদুল। ওর কেসটা অনেকটা এমন—

১৭ বছর বয়সী রাইদুল। ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। সারাক্ষণ গান নিয়ে পড়ে থাকে। গলাও বেশ। ওদিকে মা-বাবার তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন। পরিবারে ওই বড়। আর্থিক অবস্থাও ভালো না। তাই তাদের ইচ্ছা, পড়াশোনা করে পরিবারের হাল ধরুক। কিন্তু গান তো খাবার জোটায় না!

ওর সাথে কথা বলে ওরা বুঝতে পারল, ছেলেটা প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছে। ও সব বোঝে, কিন্তু মনের নিয়ন্ত্রণ তো ওর কাছে না। পড়া ওকে টানেই না। বেঁচে থাকার ওপর তাই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে ও। যদিও আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়নি ও, তবে ওরা বুঝতে পারল, এ বিতৃষ্ণা ওকে সে পথে ঠেলে দেবে কিংবা জীবনটাকে ধসিয়ে ছাড়বে। ওর কাছ থেকে আত্মহত্যা না করার ওয়াদা নিয়ে আর বাসার ঠিকানা নিয়ে ওকে সেদিনের জন্য ছেড়ে দিল ওরা।

দু-দিন টানা চিন্তাভাবনার পর হুট করেই টিমটা উপস্থিত রাইদুলের বাসায়। গিয়ে দেখে আরও ভয়াবহ অবস্থা। ওর এক ছোট বোন প্রতিবন্ধী। মায়ের মেজাজ তাই সারাক্ষণ তুঙ্গে। রুক্ষ, খিটখিটে। ওদেরও সহজভাবে নিতে পারলেন না। রাইদুলকে নিয়ে কথা বলতে এসেছে শুনেই দূর দূর করে উঠলেন তিনি, 'ওরে নিয়া আবার কিসের আলাপ! দামড়া পোলা, খাইয়া খালি অন্ন ধ্বংস করে। পড়াশোনার খবর নাই, খালি মাডে-ময়দানে ঘুরে। মাগনা মাগনা খাওন পায় তো, পোলা ঠিক পায় না! তোমাগোরে দেইখাও তো সুবিধার লাগতাছে না, তোমরাই ওর মাথাডা...।'

ওরা পগারপার। মহিলার তো কথা শোনার মানসিকতাই নেই। তবে রাইদুলের উপার্জন যে এ পরিবারের জন্য খুবই জরুরি, তা বুঝতে পারল ভালোভাবেই। পরদিন রাইদুলকে আবার ডাকল ওরা।

-তুমি কি উপার্জনের চেষ্টা করেছ কখনো?

-আমি? কামাই? এই পড়াশোনা নিয়ে চাকরি?!

-উপার্জন মানেই কি চাকরি? তুমি এ গান দিয়েই তো অর্থ উপার্জন করতে পার। তবে এ জন্য চাই দক্ষতা। তারও আগে তোমার হতাশা ঝেড়ে ফেলা। তুমি পারবে, তোমাকে পারতে হবে—এ জিদ নিয়ে থাকা। হতাশা কখনো কিছুর জন্ম দিতে পারে না। কেবল কেড়েই নেয়...।'

তিতিন উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি বোঝাতে থাকে, হালাল উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু গান গেয়ে হালাল উপার্জন কী করে সম্ভব? রাইদুলের প্রশ্নে হাসে। ইসলামী সংগীতের কিছু রেকর্ডেড টেপ ধরিয়ে দেয় ওর হাতে।

রাইদুলের আগ্রহ বাড়ে। সাথে বাড়তে থাকে বাবা-মায়ের বকা আর চাপ। কিন্তু গাওয়ার নেশায় আর 'এসো বাঁচি' টিমের নিয়মিত কাউন্সিলিংয়ে ও এসব কানেই তোলে না। নিজ এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এরপর সামান্য অর্থের বিনিময়ে অন্য এলাকায়ও ও গাইতে থাকে। এভাবে অল্প অল্প করে তার হাতে টাকা আসতে শুরু করে। পরিবারেও অল্প অল্প দিতে থাকে। ধীরে ধীরে কমতে থাকে পরিবারের অভিযোগ, কমে যায় গাওয়ার পথে বাধাও।

একদিন রাইদুল টিম-মিটিংয়ে হাজির। ওদের কিছু খাওয়াবে। ওরা বারবার না করেও এড়াতে পারেনি। তিতিন হুট করেই বসে বসল, 'না খাইয়ে তুমি বরং সে টাকাটা আমাদের ফান্ডে দাও।

-ফান্ড? কিসের ফান্ড?

প্রশ্নটা টিমের সবার চোখেও। কারণ, তাদের স্থায়ী কোনো ফান্ড নেই।

-তুমি তো কিছু একটা করতে পেরেছ, অনেকে হয়তো শত চেষ্টায়ও কিছু পারবে না। তাদের আমরা না হয় কিছু হেল্প করলাম।

-সত্যি? বলে পাঁচ শ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরল রাইদুল। ওর চোখে খুশির ঝিলিক।

শুরু হলো টিমের ফান্ড-কালেকশন। টিমের প্রতি কৃতজ্ঞদের ভালোবাসার হাদিয়া। যা এখনকার 'আঁচল'-এর একটা উৎস ছিল শুরুর দিকে।

সেই কেস থেকে তিতিন শেখে, বৈধ নেশাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তাতে উন্নতি করা যায় দ্রুত। বাবা-মায়ের উচিত, সন্তানকে তার ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ছেড়ে দেয়া। সন্তান অনেক সময় চাইলেও তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। মনের সায়ের ওপর কি জোর চলে? ফলে তারা ভোগে হতাশায়। কখনো ক্যারিয়ার নিয়ে, কখনো সন্তান হিসেবে ব্যর্থতার দায় নিয়ে।

আজ যদি রাইদুল আত্মহত্যা করত, তাতে কী হতো? না পরিবারের উন্নতি হতো, না বাবা-মায়ের কষ্ট লাঘব হতো। বরং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকতেন

এক অপরাধবোধ নিয়ে। সে শিখল, আত্মহত্যা কেবল পরাজয়ই নয়; বরং কাছের মানুষগুলোর বাঁচার স্বাদ ছিনিয়ে নেয়া।

আত্মহত্যার প্রবণতার আরেক ভিকটিম ছিল তুবা। চার বছর সম্পর্কের পর বয়ফ্রেন্ড নাদিম ভোল পাল্টেছে। তুবা তখন অন্তঃসত্ত্বা, নাদিম এর দায় নিতে অস্বীকার করে। ধীরে ধীরে সে আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ওদের ওর খবর দিয়েছে তুবার বান্ধবী শ্যামলী। ওরা একদিন তুবাকে ডাকে। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে ও।

–তাই বলে তুমি আত্মহত্যা করবে? নাদিমকে এখনো ভালোবাসো, তাই?

মাথা নাড়ে তুবা।

–যে ছেলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, নিজের সন্তানকে অস্বীকার করে, ভালোবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়; সে কি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য?

উত্তর দেয় না তুবা। উত্তর দেয়ার মতো কিছু নেইও।

–সে আসলে তোমাকে ভালোবাসেনি। ভালোবেসেছে তোমার নারীত্বকে। তোমার আবেগের সুযোগ নিয়ে তোমাকে ইউজ করেছে। প্রয়োজন ফুরাতেই ছুড়ে ফেলেছে। তাকে তুমি ভালোবাসতে চাইছ?! ছিহ্!

–ও এমন না! ক্যারিয়ার আর পরিবারের জন্য ও পিছু ফিরে গেছে।

–এখনো তার পক্ষ নিচ্ছ তুমি? মেনেও যদি নিই যে, ও এমন না; তবু দেখো, সে তোমার ওপর ক্যারিয়ার আর পরিবারকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সে কি আগ থেকেই এসব জানত না? জানত। এরপরও কেন তোমার সাথে সম্পর্কে জড়াল ও? তোমাকে স্বপ্ন দেখাল? সে কি প্রতারণা করেনি? অসৎ আর প্রতারক কি ভালোবাসার উপযুক্ত?

আরও খানিক পর তুবা যেন নরম হয়ে আসল। ওর চোখের দৃষ্টি পাল্টাতে লাগল। আচমকা ভাঙা গলায় বলল,

–কিন্তু সন্তান?

তিতিনরা জানে, সমাজে এ সন্তান নিয়ে চলাফেরা কতটা কঠিন। এ সন্তানের ওপর কতটা তাচ্ছিল্য যাবে সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। তবু দমল না।

–সন্তানের কী অপরাধ? তাকে তার মতো থাকতে দাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও,

তাওবা করো। পরিবারের লোকের কাছে সত্যটা বলো। তারা তোমাকে অন্যত্র সরিয়ে নিক আর সন্তান হওয়ার পর অন্য কাউকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিক। অল্প কয়েকদিন মাত্র! দেখবে, আরও অনেক উপায় খুলে যাবে। তুমি যদি সততার সাথে তাওবা করো, আল্লাহ তোমাকে সৎ পথে চলার পথ দেখিয়ে দেবেন।

তুবার তবুও যেন সাহস হয় না।

–দেখো তুবা! তোমার প্রাণের স্রষ্টা কি তুমি?

না–সূচক মাথা নাড়ে ও।

–সন্তানের?

আবারও মাথা নাড়ে।

–যে প্রাণের তুমি স্রষ্টা নও, সে প্রাণের মালিকও তুমি নও। তবে কোনো অধিকারে তুমি এ প্রাণকে হত্যা করবে?

তবু তুবার মুখ থেকে মেঘ কাটে না। ওদের কথায় সায় জানাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার মতো কোনো চিহ্ন 'এসো বাঁচি' টিম দেখতে পাচ্ছে না। আরও বোঝানোর পর তিতিন অন্য পথে আগাতে চাইল।

–তুমি মুসলিম?

–হ্যাঁ।

–নাহ্, তুমি মুসলিম নও।

–আরে না, আমি মুসলিম!

–আমি বলছি তুমি মুসলিম নও!! হতে পার না!

–কেন মুসলিম হতে পারি না, বলছেন! এবার যেন তেতে উঠল তুবা।

–যদি তুমি মুসলিমই হও, তবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ কেন! একজন মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য হলো জান্নাতে যাওয়া। আর আত্মহত্যাকারী কখনো জান্নাতে যাবে না, হাদীসে এমনটাই আছে।

তুমি কী ভাবছ? আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়ে যাবে?

বোন রে! সমাজের নিন্দা, পরিবারের গঞ্জনা ক'বছর? ১০? ২০? ৪০? কিন্তু আত্মহত্যা করার অসহনীয় শাস্তি বছরের পর বছর। হয়তো অনিঃশেষ। সীমিত কষ্ট

থেকে বাঁচার জন্য অসীম কষ্টকে বেছে নিচ্ছ? এ কি উত্তপ্ত কয়লা থেকে বাঁচতে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেয়া নয়?

তুবা নিশ্চুপ।

–তুমি কি জানো, তুমি কেন মরতে চাইছ? কারণ, তুমি ভীতু। পালিয়ে বেড়াচ্ছ নিজের থেকে, সমাজ থেকে। সবার সামনে নিজেকে প্রমাণ করার মতো সাহস তোমার নেই। মাথা উঁচু করে বাঁচার দৃঢ়তা তোমার নেই। তোমার সামনে এখন এক চ্যালেঞ্জ। সততার সাথে তাওবার চ্যালেঞ্জ। সন্তানকে আদর্শভাবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ। লোকটার প্রতারণাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই ভ্রষ্ট সমাজ নামের নর্দমার মাঝেও আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ। আজকে তুমি নিজেকে সৎ প্রমাণ করতে পারলে আর সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জিতে যেতে পারলে আর কারও কাছে না হোক, নিজের কাছে তুমি একজন বীর। হয়তো সন্তানের কাছে হবে এক আদর্শ মা। বিবেকের কাছে থাকবে স্বচ্ছ। আর মরে গেলে এর কিছুই তুমি পারবে না! এতে শুধু তুমি মরবে না, হত্যা করবে এক সন্তান, এক সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার। হাতছাড়া হয়ে যাবে তোমার সুপথে ফিরে আসার শেষ সুযোগটুকুও, আর সুযোগ করে দেবে ওই পুরুষরূপী পিশাচগুলো আরও দাপটের সাথে বাঁচার। আরেকটা মেয়ের জীবন সে নষ্ট করবে, সেও হয়তো চুপচাপ মরে যাবে। এই তোমাদের কারণেই আজ এ নোংরা মনের লোকগুলো আরও পেয়ে বসছে। নিজে সৎ হয়ে যাও, আগের করা অনৈতিকতা থেকে নিজেকে ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলো। দেখবে সৃষ্টিকর্তাও তোমার প্রতি দয়া করবেন..।'

আরও বেশ খানিকক্ষণ পর তুবা উঠে গেল 'এসো বাঁচি' টিমেরও আর দেয়ার মতো সময় ছিল না। তুবাকে রিকোয়েস্ট করল আগামীকাল আবারও ওদের একটু সময় দিতে। ও সায় জানিয়ে চলে গেল।

কিন্তু তুবা আর এল না। দুদিন অপেক্ষা করে শ্যামলীর কাছে গেল ওরা। কিন্তু ওর কাছেও কোনো আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া গেল না। যেদিন ওদের সাথে কথা হয়েছিল, সেদিনই ওর সাথেও লাস্ট কথা হয়েছে তুবার। এরপর থেকে সেও পাচ্ছে না। প্রায় এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর ওরা তুবার আশা ছেড়ে দিল। নতুন কেস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। ছয় কি সাত মাস পর অপরিচিত এক নম্বর থেকে যোগাযোগ করে তুবা।

জানা গেল, সেদিন ও বাসায় গিয়ে সব জানিয়েছিল। বলেছিল, সে কী চায়। পরিবারের লোকেরা প্রথমে ওর ওপর চড়াও হলো, এরপর এবোরশন করার জন্য চাপ দিল। কিন্তু তুবা টলেনি। সব কথা ও অত্যাচার সহ্য করে অটল রইল ও। যখন সবাই দেখল, হয় ওর সিদ্ধান্ত মানতে হবে নতুবা ওকে হারাতে হবে; অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিল। গ্রামে সন্তান হলো ওর। সবাই জানল, জামাই বিদেশ। ঢাকা একজনের কাছে এখন দেখশোনের ভার দিয়েছে। দু-মাস বয়স এখন। খরচ ও-ই জোগায়। পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম জব নিয়েছে।

বলতে বলতে আনিকা কেঁদে দিল, 'বাবুকে যখন দেখি আর ভাবি, ওকে আমিই হত্যা করতে গিয়েছিলাম, আমার পৃথিবীটা আঁধার হয়ে আসে। ওকে ছেড়ে মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে হয় না। দ্রুতই ওকে আমার কাছে আনতে চাইছি। ওকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই আমার এখনকার চ্যালেঞ্জ। দোয়া চাই আপু! আরও বলল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা, নতুন জীবনের কথা, জীবনকে নতুনভাবে দেখতে পারার কথা। 'এসো বাঁচি' টিমের অন্তর জুড়িয়ে যায়।

সব কেসেই তারা সফল এমনটি বলা যাবে না। তাদের শত চেষ্টার পরও কিছু আত্মহত্যা রুখতে পারেনি তারা। তবে তাদের সফলতার ভাগ ৫৫% তো হবেই। এটাই-বা কম কিসে!

তিতিনকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিভিন্ন কলেজে, প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে গেল তাদের এ কার্যক্রম। ধীরে ধীরে হলো আঁচল।

আঁচলের শুরুর দিককার কথা। তিতিন সবে পড়া শেষ করেছে। ও তখন পুরোদস্তুর তাওফীকা। তিতিন নামে কেউ ওকে জানে না। আঁচলের অফিস বলতে তখন একটা টিনশেড রুম। আধভাঙা একটি টেবিল আর কয়েকটি পুরোনো চেয়ার। দিনে সেটা এক কোচিং সেন্টার। টিচার ২ জন—নায়লা আর তিতিন। ওদের এতকালের টিউশনির সুনামে ভর করে এই ছোটখাট সেন্টার খোলার সাহস করে ওরা। ছাত্রী নেহাত মন্দ নয়, ওদের চলে যায়। সমাজ নিয়ে কাজ করবে বলে ধরাবাঁধা কোনো ক্যারিয়ারের দিকে ওরা যায়নি। যখনই আঁচলের কোনো কাজ আসত, তারা এসবের মাঝেই সময় দিত। তখনো তেমন জমেনি বলে খুব সমস্যা হতো না। রাতে তিতিন তাতে তালা দিয়ে হোস্টেলে পৌঁছাত।

একদিনের কথা। সেদিন তিতিনের একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল সজাগ হতে। নাস্তা না করে তাই দ্রুত অফিসে চলে এল। গার্ড চাচাকে টাকা দিয়ে অনুরোধ করল দুটো

পরোটা এনে দিতে। চাচা চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কী মনে করে ফিরে তাকালেন,

-একজন লোক তোমার সাথে দেখা করতে আসছিল ঘণ্টাখানেক আগে। আমি দশটার দিকে আবার আইতে কইছি।

-আচ্ছা, চাচা।

সাড়ে নয়টা। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিতিন ভাবল, নায়লাকে একবার ডাকবে নাকি! নতুন কেস বোধহয়। আবার ভাবল, অবস্থা বুঝে দেখা যাবে।

নাস্তাটা খেয়ে সেরেছে কি সারেনি, দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো। চট করে হাত ধুয়ে নাস্তার প্লেটটা টেবিলের নীচে রেখে দিল তিতিন। বোতল থেকে পানি খেয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই দেখল এলোমেলো চুলের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো টকটকে লাল। পরনে পুরোদস্তুর বিজনেস স্যুট। একটু ভয় লেগে এল ওর।

-'আসুন' বলে লোকটিকে প্রবেশের জায়গা করে দিল ও।

কিছুটা ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকল লোকটা। টেবিলের এপাশে লোকটিকে বসতে ইশারা করে নিজে ওপাশে গিয়ে বসল। দরজা খোলাই রইল।

-আপনার পরিচয়?

-আপনি তিতিন তো?

আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল তিতিন। বহুদিন এই নামে কেউ ডাকে না ওকে। ও নিজেই মুছে দিয়েছে ওর এই পরিচয়। তবু বহু, বহু দিন পর নামটা শুনে কোথায় যেন একধরনের ব্যথা শুরু হলো ওর।

-কে তিতিন?

-আপনি তাহলে তিতিন নন? লোকটার গলা হতাশ শোনাল।

-হলেই-বা কী? না হলেই-বা কী?

তিতিনের দ্বিমুখী উত্তরে লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

-আপনি আগে আঁকাআঁকি করতেন?

'এখনো করি' বলতে গিয়েও চেপে গেল তিতিন। লোকটার মতলব না বুঝে পরিচয় দেয়াটা ঠিক মনে করল না ও। যতই হোক, তিতিন নামটার সাথে যে অনেক লুকোনো গল্প জড়িয়ে আছে! কী দরকার অজান্তেই অজানা কাউকে সে

গল্পের সুড়ঙ্গমুখ দেখিয়ে দেয়ার!

আচ্ছা, লোকটা কোনো সাংবাদিক নয় তো? এর আগেও কোনো কোনো সাংবাদিক অনেক চেষ্টা করেছে আঁচলের 'তাওফীকা'র অতীত জানতে, কিন্তু মুখ খোলেনি ও। এ লোকটা কোনো নাছোড়বান্দা সাংবাদিক নয় তো?! কিন্তু তিতিনের খোঁজ সে পেল কী করে?

সতর্ক কণ্ঠে তিতিন উত্তর দিল,

–এখানে যারা আসে, তারা আমাদের জেনেই আসে। আমরা তাদের জানার জন্য প্রশ্ন করি। বিশ্বস্ততা নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আপনি আসতে পারেন।

–আপনি কি আপনার পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন?

–আপনার কি তাই মনে হচ্ছে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়ে দিল তিতিন।

লোকটি একটু দ্বিধায় পড়ে গেল,

–দেখুন! ভালোভাবে খোঁজ নিয়েই আমি এসেছিলাম। এখন দুইটা বিষয় হতে পারে, আপনি দ্বিধা করছেন অথবা আমার অনুসন্ধানে কোনো ফাঁক রয়ে গেছে। সেটুকুও আমি খুঁজে বের করবই।

লোকটার দৃঢ়তা দেখে অবাক হলো তিতিন। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কী এক গ্যাঁড়াকলে পড়া গেল! তিতিনের মুখ দেখেই যেন মন পড়ে নিল লোকটি। স্বর নরম করে বলল,

–আপনি যদি আমার কাছ থেকে কোনো বিপদের বা নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা করে থাকেন, তাহলে আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আশা করি, ভয় কেটে যাবে। আমি সাইফুল।

স্বাভাবিক স্বরে বলা কথাগুলো তিতিনের কানে অবিশ্বাস্য ঠেকল। লোকটার দিকে আবারও তাকাল, সাইফুল!

সত্যি!

ও আবারও তাকাল!

অভিমান করে হারিয়ে যাওয়া সাইফুল!

মাঝে মাঝেই অবচেতন মনে উঁকি দিয়ে যাওয়া সাইফুল!

–আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি?

প্রশ্নটি তিতিনের কানে যেন যায়নি। ও চেয়েই রইল অথবা তাকিয়ে হারিয়ে গেল। কিছু পর যখন সংবিৎ ফিরে এল, ওর সামনে কেউ নেই।

কিছু নেই।

ও ছুটে বেরিয়ে এল।

নাহ্, সাইফুল নেই।

রাস্তায় একটা গাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

ধুলোর আড়ালে ধুলোর ছেলে আবার ধুলোতেই ফিরে গেল।

ধাতস্থ হওয়ার পর তিতিনের নিজেকে এলোমেলো লাগল। এতদিন নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখা তিতিন আজ এক ছায়ার কাছে পরাজিত। সাইফুল কেন চলে গেল আবার? ওর উত্তরের অপেক্ষা করে যেতে পারত!

বেশ কয়েকটা দিন ওর কেমন ঘোরে কেটে গেল। রাস্তার সব লোকের মাঝে ও সাইফুলকে খুঁজতে লাগল। ক'দিন পর ঘোর কেটে গেল।

ঘোর কেটে যাওয়ার পর ও নতুন করে ভাবতে বসল। সাইফুলকে দেখে ও হঠাৎ উতলা হয়ে উঠল কেন! এটা অন্যায়, অনুচিত। ওর সাথে ওর বিয়ে হয়নি, ও ওর মাহ্‌রামও নয়। ও তেমন পর্দা করতে পারে না, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ও সব সামলে উঠতে পারেনি; তাই বলে ফ্রি মিক্সিং কিংবা অবৈধ রিলেশনগুলো ও সমর্থন করেনি কখনো। ধর্মীয় বিধান ছাড়াও বিভিন্ন কেইসে ও দেখেছে, কতটা ভয়াবহ এর পরিণাম। আত্মহত্যার প্রধান কারণের একটি এই অবৈধ প্রেম। হতাশা আর জীবন ধ্বংসের এক সরল মাধ্যম এই প্রেম। পর্দা করতে না পারার অনুশোচনাও ওর মধ্যে কম নেই। কতদিন ভেবেছে, যদি একজন মাহ্‌রাম হতো!! কিন্তু বিয়ে করার জন্য নিজেকে কখনোই প্রস্তুত করতে পারেনি। কেন, তা সে জানে না।

সে কি মনে মনে সাইফুলের জন্য অপেক্ষা করছিল, যে ওর জীবনের ভিত গড়ে দেয়ার কারিগর? কই! অবসরে এক দীর্ঘশ্বাসের বাইরে তো কোনো প্রার্থনা ছিল না তার জন্য! সেই দীর্ঘশ্বাসের পেছনেও ছিল কেবলই অনুতাপ। ওর জন্য একজনের হারিয়ে যাওয়ার অনুতাপ। সে অনুতাপই কি কালে প্রণয়ে রূপ নিয়েছে? বয়সের অবাধ্য হস্তক্ষেপে অনুরাগ জন্মেছে? উঁহু! এ উচিত নয়।

নিজেকে সামলানোর তাগিদে সাইফুলকে ভুলতে চাইল ও। কিন্তু ভুলতে চাওয়া

মুখগুলোই যেন আরও বেশি চেনা হয়ে ধরা দেয়। ও আর ভোলার চেষ্টা করল না, কাজে ডুবে গেল। অবহেলার অভিমানেই যেন অনুরাগ, প্রণয় সব আবারও এক ঝড়ো বাতাসের রূপেই ফিরে গেল। অবসরের বিলাসিতা হয়ে স্মৃতিরা কৃষ্ণচূড়ার ডালে আন্দোলিত হতে থাকল।

তাওফীকা হাসানের চোখ জলে ভরে এল। অভিমানী কিশোরীর মতো সশব্দে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। আইদা সে জলে ভেজা চোখের দিকে তাকাল, তাতে যেন ভেসে আছে অনেকগুলো পদ্ম। তাওফীকার বেদনাগুলো পদ্মপাতায় ভর করে ভেসে চলেছে। আইদার মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল।

সাইফুলের সাথে দ্বিতীয় এবং শেষবারের মতো সাক্ষাৎ, না না, কথা হয়েছে গত বছর।

ক্লান্তিকর দিনশেষে আঁচলের অফিসের ডান পাশেই ওর জন্য নির্দিষ্ট রুমটায় কেবল গিয়েছে। চুলায় চায়ের জন্য পানি ফুটতে দিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লম্বা এক শ্বাসে বাতাসের ঘ্রাণ নিতেই হাতের ফোনটা কেঁপে উঠল। একটু অবাকও হলেন। পার্সোনাল নাম্বারে কমই ফোন আসে তাওফীকার। তাও আবার আননৌন।

–আসসালামু আলাইকুম।

–ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

পুরুষ-কণ্ঠ শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন তাওফীকা।

–কে বলছিলেন?

–তুমি কি আমাকে কখনোই চিনবে না?

–সাইফুল! অজান্তেই, অস্ফুটে নামটা বেরিয়ে এল তাওফীকার মুখ থেকে।

–যাক, বাবা! এবার তো অন্তত চিনতে পেরেছ!

সাইফুলের স্বরে কোনো জড়তা নেই, যেন নিত্য নিত্য কথা হয় তাওফীকার সাথে। এর বিপরীতে তাওফীকা একেবারেই আড়ষ্ট। কথাই বের হচ্ছে না তার স্বর থেকে। একপর্যায়ে সাইফুল জিজ্ঞেসই করে বসল,

–আমি কি কল দিয়ে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেললাম?

–না, না..।'

–তবে কি অস্বস্তি বোধ করছ?

'না' বলতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি। মিথ্যে বলবেন কেন, আসলেই অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। একে সাইফুল ততদিনে তার এক স্মৃতির নামই কেবল। অবচেতন মন হয়তো তাকে বাস্তব করে সহজে মেনে নিতে চাচ্ছে না। নাহ্, এটা নিজের কাছেই কেমন ঠুনকো ঠেকল! কী বলবেন তিনি?

–তা তো কিছুটা হচ্ছেই।

–কেন?

–অনেক কারণেই হতে পারে। এই ধরুন, আপনি আমার নম্বর পেলেন কোথায় সেটা না জানার কারণেও হতে পারে!

–ওহ্, আচ্ছা! একটু হাসল সাইফুল, 'তুমি এখন অগ্রসর নারীদের আইডল আর এটা জানো না যে, প্রযুক্তি কতটা এগিয়ে গেছে!

কথাটার মধ্যে কি কিছুটা তাচ্ছিল্যও লুকিয়ে ছিল?

তাওফীকা আপনাতেই কিছুটা হীনম্মন্যতায় ভোগেন। সেক্যুলার সমাজব্যবস্থা, ছদ্মবেশী সুশীলরা তাকে উৎসাহ দেয়, এগিয়ে যেতে বলে; কিন্তু মুখোশের আড়ালে লুকানো তাদের চেহারাটাও তিনি চেনেন। আঁচলে কোনো পুরুষ পরিদর্শক ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন না। এ নিয়ে তাদের উক্তির শেষ নেই। এক মানবাধিকার কর্মীর কাছে একবার প্রয়োজনে গিয়েছিলেন তাওফীকা। তার তেলতেলে হাসির পেছনে থাকা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতেই ঘৃণায় ফিরে এসেছিলেন তিনি। তিনি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের দিয়ে ব্যবসা খোলেননি। শুধু একজন ছেলের অভাবে তাওফীকাকে এখনো এভাবে ঘোরাফেরা করতে হয়। নিজের মানুষ নেই, অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়াও মন মানেনি। নায়লার বিয়ের পর অবশ্য নায়লার হাজব্যান্ডকে দিয়ে অনেক হেল্প পাওয়া যায়। কিন্তু তবু...।

সাইফুল কি তাকে তথাকথিত এই প্রগতিশীলদের তালিকায় ফেলছে? তাওফীকা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

–আচ্ছা, এর মানে বলবেন না কোত্থেকে পেয়েছেন।

–বলব না কেন! আমার যে কাজ, তাতে নম্বর সংগ্রহ মামুলি বিষয়।

'কী কাজ' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি। কথা বাড়াতে চাইছেন না। সাইফুল আরও কিছু কথা বলে রেখে দিল। পরদিন আবার কল দিল। পরের দিন আবার।

তাওফীকা দেখলেন, ধীরে ধীরে তিনিও যেন কথার সীমা অতিক্রম করা শুরু করেছেন। নিজেকে শাসালেন। কী লাভ পেছনে ফেলে আসা স্মৃতিটুকু আরও বাড়িয়ে?! সাইফুলকে যোগাযোগ করতে বারণ করে দেয়া উচিত। যতই হোক, তাদের উভয়ের মনেই পরস্পরের প্রতি কিছু ভালোলাগা আছে। আছে হারাম সম্পর্কে জড়ানোর সব রকম উপকরণ। কিন্তু তবু কেন যেন... হয়তো কৃতজ্ঞতার দায় থেকে কঠোর হতে পারছিলেন না।

তিনি বুঝলেন, অবৈধ রিলেশনশিপগুলো কী করে এগিয়ে যায়! আবেগের তক্তপোশে আটকে গিয়ে নিজেদের সীমা অতিক্রম করা ছেলেপেলেগুলো কী করে বিপথে যায়! ইসলামের পর্দার বিধান তো আর এমনি এমনি হয়নি। যখন গাইরে মাহরামের সাথে অপ্রয়োজনীয় পরিচয়ই হবে না, তখন বিপথে যাওয়ার সুযোগও তৈরি হবে না। ধর্মের প্রতিটি বিধানই কী সুন্দর!

তাওফীকা মুহূর্তেই দুটো সিদ্ধান্ত নিলেন :

১. সাইফুলকে বারণ করতেই হবে। আজই। আবেগের গাছে যথেষ্ট পানি ঢালা হয়েছে। এবার শুকোতে দেয়া উচিত।

২. নায়লার হাজব্যান্ডকে আঁচল টিমের অংশ করে নিতে হবে। বাইরের সমস্ত কাজ সে পালন সারবে। অভ্যন্তরের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখবেন। যোগাযোগের বিষয়টি নায়লা সামলাবে।

যথারীতি সাইফুল ফোন দিল। তাওফীকা নিজেকে শক্ত করলেন,

–সাইফুল!

–হ্যাঁ, বলো!

–আমি চাচ্ছি না আমরা আর যোগাযোগ করি।

–কেন?! কোনো কষ্ট দিয়েছি কি তোমাকে? বা সীমাতিক্রম করে ফেলেছি কি?

–না, কষ্ট দেয়ার জন্য বলছি না। সীমাতিক্রম তো হচ্ছেই। ধর্মীয় অনুশাসন বলো

কিংবা বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে বলো, এভাবে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাসী নই। এতে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না।

-তিতিন! সাইফুলের কাছে তাওফীকা হয়তো তখনো ছোট্ট তিতিনই।

-হ্যাঁ, বলো!

-আমি জানতাম, তুমি একদিন এ কথা বলবেই। আমারও এভাবে কথা বলা পছন্দ নয়। কিন্তু...।

-তবে আর কিন্তু কেন!

-একটা কথা!

-হ্যাঁ, বলো!

-কিছু মনে করো না প্লিজ। সাইফুলের কণ্ঠ কাঁপছে কি? নাকি তাওফীকা ভুল শুনছেন?, 'তুমি বিয়ে করোনি আমি জানি। হয়তো জানো না, আমিও করিনি। তুমি কেন করোনি আমি জানি না, কিন্তু আমি করিনি তোমার জন্যই। আমি তোমার যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি, যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি। পড়াশোনার দৌঁড়ও খুব বেশি নয়। এরপরও বলতে হচ্ছে বলে বলছি, যদি আমাকে তোমার খুব বেশি অযোগ্য মনে না হয়..।'

তাওফীকা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কী বলবেন? এমন কোনো কথা আশা করেননি তিনি। সাইফুল বিয়ে করেনি, তা অবশ্য তিনি ভেবেছিলেন। কেন করেনি, তা নিয়ে আগ্রহ দেখাতে যাননি। এ নীরবতাকে ভুল ভাবল সাইফুল,

-দেখো, যদি তোমার মত না থাকে, নির্দ্বিধায় না করে দিতে পার। আমি মোটেও কষ্ট পাব না। আর যদি সামান্য সুযোগও থাকে, না কোরো না প্লিজ!

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে, দীর্ঘ একটা সময় চুপ থেকে তাওফীকা সময় চেয়ে নিলেন।

সেদিন সারারাত ছটফট করলেন। ভাবনার উর্মিমালায় প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগলেন; জলোচ্ছ্বাসে কোনো নাজুক তরীও হয়তো এতটা দোলে না। তার হৃদয় কাঁপতে লাগল; মানুষের ফুসফুসও বোধহয় এতটা কাঁপে না।

স্বপ্নীল রঙে উজ্জ্বল চোখ ক্লান্তিরেখায় থমকে দাঁড়াতে লাগল, আবার মুখের চিন্তাক্লিষ্টভাব দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। মনের আলোআঁধারির লুকোচুরিতে কখন যে পরদিনের সূর্যটাও লুকিয়ে পড়ল টেরই পেলেন না তিতিন। মাগরিবের

আযানে সংবিৎ ফিরে পেলেন। নামাযান্তে কাঁদলেন, প্রচুর কাঁদলেন। তার কাঁদার জায়গা যে এই একটাই, আশ্রয় যে শুধু এখানেই; মমতাময়ী মায়ের কোল থেকেও যে জায়গা আরও অনেক বেশি আপন! যে আশ্রয় আরও অনেক বেশি উষ্ণ!

যথারীতি সাইফুলের ফোন এল। তারও বুঝি দিনটা কেটেছে এমনই ছটফটানিতে, যদিও স্বর শান্ত। সৌজন্য-কথা সেরেই সরাসরি প্রশ্ন করে বসল সাইফুল। তাওফীকার মনে আবারও মেঘ ঘনিয়ে এল। সারাটা দিন তার এ নিয়েই কেটেছে। তবুও যেন মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্তটা তার কাছে বেশ ভারী, অনেক বেশিই ভারী। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হয়তো তার নেই; কিন্তু দুনিয়ার বুকে তার হয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ারও যে কেউ নেই! এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে হতে চাচ্ছে তাকে কি তিনি গ্রহণ করতে পারবেন?

বারান্দায় গেলেন তাওফীকা। শহরের নিয়ন আলোর ওপরে সাদা রঙের চাঁদটাকে বড় অপার্থিব মনে হচ্ছে। কাকে যেন তিনি খুঁজলেন সেদিকে তাকিয়ে। হয়তো মাকে! কিংবা হয়তো নিজেকেই! এই দুদিন নিজেকে যার শতবার ভাঙতে হচ্ছে, সে তো নিজেকেই খুঁজবে!

বড় একটা শ্বাস নিলেন তাওফীকা, যেন রাতের বাতাসে খুঁজতে চাইলেন একটুখানি স্থিরতা। মনের ভেতর যতটা ঝড় বইছে, ততটাই শান্ত স্বরে বললেন,

–সাইফুল! কষ্ট নিয়ো না। যোগ্যতার দিক ভেবে ভুল বুঝো না। আমার আজকের এই যে জীবন, এই দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা—তাতে তোমার ভূমিকা কতখানি তা বোধকরি তুমিও জানো না। সে ভূমিকাটুকুর অদৃশ্য উপস্থিতি আমার সারাজীবন জুড়েই বিস্তৃত। কিন্তু নাটাইবিহীন এ জীবনে জোড়া বাঁধার চিন্তা করার জন্য এখনো আমি প্রস্তুত নই।

তাওফীকা যেমন ভেবেছিলেন, সাইফুলের প্রতিক্রিয়া হলো তার উল্টো। সে খুব স্বাভাবিকভাবে নিল। আগের মতোই শান্ত স্বরে বলল,

–জি আচ্ছা। কখনো যদি ভাবেন, আমার বিষয়টিও একটু বিবেচনায় রাখার অনুরোধ। এ ছাড়াও কখনো যদি প্রয়োজন হয়.., প্রয়োজনের কথা এ জন্য বলছি—আমার যে জব আর আপনার যে জব তাতে হয়তো সাহায্য করা সম্ভব। এই আর কী!'

আর হ্যাঁ, এই নম্বরে আমাকে আপনি সব সময় পাবেন ইন শা আল্লাহ। এখন, দুই বছর পর, পাঁচ বছর পর.. যখন ইচ্ছা। যদি না চলে যাওয়া হয়...।

কিছু পর সাইফুল ফোন রেখে দিল। তাওফীকা শুয়ে পড়লেন। ঘুমাবেন। মনে হচ্ছে কী এক পাষাণ ভার বুক থেকে নেমে গেল। সে রাতে আর তার খাওয়া রুচল না।

তিনি এরপর বহুবার ভেবেছেন সাইফুলকে ফিরিয়ে দেয়াটা কি ভুল ছিল? আবার ভেবেছেন, তার আর কীই-বা করার ছিল! তার যে অতীত, সেটা না পারতেন কাউকে শোনাতে আর না পারতেন তাকে ঠকাতে। কাউকে কি তিনি বলতে পারতেন রিমেনের কথা? তার বাবার কথা? মায়ের কথা? নিজের কতবার হেরে গিয়ে বেঁচে থাকার কথা? বললে কি সে মেনে নিত? আচ্ছা! সাইফুল কি মানতে পারত? মানলেও কি হঠাৎই মন খারাপের কোনো রাতে সেও অন্তর্জ্বালায় ভুগত না?

যেই ভয়ে, বিশ্বাসহীনতার যে স্রোতে তিনি এখনো একা, সে আশঙ্কা যে সাইফুলের ক্ষেত্রেও নেই সেটা তিনি কী করে বুঝবেন? নাকি একবার বলে দেখতে পারতেন তাকে? জীবনে কারও-না-কারও হাতে তো বিশ্বাসের দণ্ডটা তুলে দিতে হয়! এর আগে শুধু গভীরভাবে ভাবতে হয় সে দণ্ড ধরে রাখার মতো মজবুত হাত তার আছে কি না!

চারপাশ ধোঁয়াশায় ছেয়ে ফেলা ভাবনাগুলো এক বছর আগে যেমন তাওফীকাকে ঘিরে রেখেছিল, আজও মাঝরাত্তিরে ঘুমভাঙা ঘোরে আঁকড়ে ধরে। তিনি কুঁকড়ে যান, গায়ের কাঁথাটা আরও ভালো করে পেঁচিয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করেন, এ যেন নিজের সাথেই লুকোচুরি!

রাত হয়েছে। আইদাকে শুয়ে পড়তে বললেন তাওফীকা। সাথে আনা স্লিপিং ব্যাগ খুলে শুয়ে পড়লেন দুজনেই। আইদার ঘুম আসতে দেরি হলো না।

তাওফীকা ঝুমুরের কেইসটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। গইস মিয়া এখন আছে কোথায় কে জানে! ঝুমুরকে নিয়ে গেলে আদৌ সে ঝামেলা করবে কি না সেটাও তার জানা নেই। তার লোকেরা তাদের খুঁজছে নিজেদের বোকামির জন্যই। এমন খোলামেলা চলাফেরা করা, এভাবে সবাইকে জানান দিয়ে আসা, আবার গইস মিয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর করা বোকামি নয়তো কী! তার লোকেরা তো তাদের শত্রু ঠাওরাবেই।

আগামীকাল ঝুমুরের বাড়ি যেতে হবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার কানেও পৌঁছে গেছে যে, তার 'বান্ধবী'রা এসেছে। সেও হয়তো কৌতূহলী হয়ে উঠবে, কারা তার বান্ধবী!

আচ্ছা! সকালে কোনো বিপদে পড়ে যান যদি? যদি ওই লোকগুলো বাড়ির আশেপাশে লুকিয়ে থাকে? এখন সবচেয়ে জরুরি হলো পুলিশের সাহায্য পাওয়া। জুনাইদ আর তার বসের নম্বর পেলে ভাল হতো। তাদের সৎ মনে হয়েছিল।

এইসব ছাইপাশ ভেবে রাতে তার আর ঘুম হলো না। সকাল হতেই উঠে পড়ল তারা। ভোরের ঝিরিঝিরি বাতাসে গুল্মবেষ্টিত খোলা ব্যালকনিতে বসে চা পান করার স্বাদ বুঝি একটু বেশিই হয়। দু-কাপ খেয়ে ফেললেন তাওফীকা। আয়েশ করে আড়মোড়া ভাঙলেন। বহুদিন এভাবে ঘুম তাড়ানো হয় না।

–ম্যাম, এখন আমরা কী করব?

–ঝুমুরদের বাড়ি যাব।

–যদি এ বাড়ির আশেপাশে লোক থেকে থাকে? পুলিশকে ইনফর্ম করলে ভালো হয় না?

–সে তো হয়ই। কিন্তু এ এলাকার কোনো পুলিশের নম্বর তো নেই। আর দূরের পুলিশকে এই মুহূর্তে ইনফর্ম করে লাভও নেই। এর চেয়ে বরং বেরিয়ে দেখি কী অবস্থা। তা ছাড়া লোকগুলো হয়তো ভেবেছে, আমরা কোনো হোটেলে উঠেছি। এমন আধভাঙা পোড়োবাড়িতে উঠব, তা তারা কল্পনাও করবে না।

দূরের পুলিশকে জানালে তারা তো এ এলাকার পুলিশকে জানাতে পারবে—কথাটা বলতে গিয়েও বলল না আইদা। ম্যাডামের মাথায় নিশ্চয়ই কিছু ঘুরছে নয়তো এ কথা তো তিনিও জানেন।

নাস্তা না করেই দুজন বেরিয়ে পড়ল। বের হওয়ার আগে বন্ধ দরজায় আবার ধাক্কা দিলেন তাওফীকা। খুলল না। 'আবার আসতে হবে' আনমনে বললেন তিনি।

বাড়ি থেকে খেতের আইল ধরে আবারও হেঁটে চলা। তবে এবার মোড় ঘুরে ঝুমুরদের বাড়ি। তাদের প্রয়োজন ছিল, ঝুমুর আসলেই নির্যাতিতা কি না, তা জানা। সে তারা জেনে নিয়েছেন; বরং বলা যায়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। কাজেই এখন ঝুমুরকে আশ্রয় দিতে তাদের বাধা নেই।

অনেকটা পথ হেঁটে এলেও শত্রুদলের কারও সাড়া পেলেন না তারা। বিষয়টা

অস্বাভাবিক লাগল। রাতেও বাধা পাননি, এখনো বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছেন, কিছু একটা গড়বড় লাগছে তাওফীকার কাছে। আইদাও হয়তো তাই ভাবছে। তার সতর্ক ও কিছুটা ভীত দৃষ্টি বারবার চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে তারা ঝুমুরদের বাড়ি পৌঁছলেন।

টিনের দেয়ালের ওপরে খড়ের চালা। বোঝাই যাচ্ছে, নিতান্তই মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। দুর্বল কাঠের দরজা। শিক্ষিত পরিবেশ বলেও মনে হচ্ছে না। এ পরিবেশে এতদূর থেকে আঁচলের খোঁজ পেল কী করে ঝুমুর? চিঠির ভাষাও যথেষ্ট শিক্ষার পরিচয় দিয়েছে তার। অনেকটা কৌতূহল নিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন, বলা ভালো—চাটি মারলেন তাওফীকা।

একবার, দুবার, কয়েকবার আওয়াজ দেয়ার পর কোনো সাড়াশব্দ ছাড়াই হুট করেই দরজাটা খুলে গেল। একজন প্রৌঢ়া দাঁড়িয়ে। খুব নাজুক না হলেও দেহের শক্তির চেয়ে মনের শক্তির জোরেই যে তিনি এখনো শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তা বোঝাই যায়।

–আসসালামু আলাইকুম, খালাম্মা। আপনি নিশ্চয়ই ঝুমুরের মা?

বৃদ্ধার চোখেমুখে একধরনের শঙ্কা কাজ করছিল। তাওফীকার বসন-ভূষণে আর এখনের আন্তরিক স্বরে তা কেটে গিয়ে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি জানতে চাইলেন,

–আফনেরা কি আঁচলের লোক?

অবাক হলেন না তাওফীকা। তিনি বুঝেছিলেন, তাদের নিয়ে গ্রামে সম্ভবত এক সাড়া পড়ে গিয়েছে। ঝুমুরকে বুদ্ধিমতী মনে হয়েছে। তার বুঝে যাওয়ার কথা, কারা এসেছে।

হেসে তাই সম্মতি জানালেন তিনি। বৃদ্ধা সরে জায়গা করে দিলেন।

ভেতরে পরিসর অত্যন্ত কম। টিনের ফাঁক গলে ভেতরে প্রবেশ করা সূর্যের আবছা আলো ভেতরে থাকা একটা চৌকি, দুটো চেয়ার আর টুকটাক তৈজসপত্রে যেন আরও বেশি ম্লান দেখাচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ে না, কিন্তু চারপাশে চোখ বুলাতে গিয়ে দেখা গেল ঘরের কোণ ঘেঁষে এক মেয়ে দাঁড়ানো, চোখে তার স্পষ্ট ভীতি। বলে দিতে হলো না, বোঝা গেল এ-ই ঝুমুর। আঁচলের ভবিষ্যৎ সদস্য। হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই তাকে সদস্য করে নেয়ার একরকম সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নিয়েছেন।

মিষ্টি করে হাসলেন তাওফীকা। এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

–কেমন আছ, ঝুমুর?

মেয়েটির মুখে হাসি ফুটল,

–ভালো আছি, আপু। আপনারা কেমন আছেন?

ধীরে ধীরে মেয়েটা স্বাভাবিক হলো। এমন সন্ত্রস্ত কেন ছিল প্রশ্নের উত্তরে কেঁদে ফেলল সে। গইস তাকে ছেড়ে দিলেও তার যন্ত্রণা বন্ধ হয়নি। সে কিংবা তার লোকেরা কেউ-না-কেউ এসে উৎপাত করবেই। নানা বাজে ভাষায় সম্বোধন, বিভিন্ন বাজে ইঙ্গিত আর লোকসম্মুখে লাঞ্ছিত হতে হতে জীবনের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে ও।

কথায় কথায় ও বলে চলল ওর জীবনের গল্প। গাঁয়ে বেড়ে ওঠা লতানো শৈশবের দিনগুলো কী করে কয়লাকালো ভস্মে পরিণত হল, সে গল্পের শব্দমালা ঘরময় ছুটে বেড়াল। বিষাদের বিষাক্ত বাতাস সইতে সইতে ঝুমুর আর তার মা অভ্যস্ত হয়ে গেলেও অশ্রুসিক্ত হতে হলো তাওফীকা ও আইদাকে।

তাওফীকা তবু মনে মনে কী যেন ভাবছেন। আরও এদিক সেদিকের আলাপ হতে হতে প্রশ্নটা করেই ফেললেন, 'আঁচলের খোঁজ পেলে কী করে?

–গইস মিয়ার কাছেই। সে আপনার সবকিছু সংরক্ষণ করে রাখত। এক পত্রিকায় আপনার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। সে সেটাও কেটে তার ফাইলে রেখেছে। সেখান থেকেই জেনেছি।

তাওফীকা কেমন বিষণ্ন হয়ে গেলেন। কথার উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন যেন। আরও কিছু কথা-বার্তার পর খুব শিঘ্রি মা ও মেয়ে দুজনকেই আঁচলে উপস্থিত হতে বললেন। তারা আগামীকালের মধ্যেই প্রস্তুত হতে পারলে তাদেরও সঙ্গী হতে পারে বলে জানালেন।

মূলত তারা এসেছিলেন, কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে, সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে গাঁয়ে পা দেয়ার সাথে সাথেই। এ কেইসের সাথে তাওফীকা যুক্ত হয়েছিলেন যতটা না সরেজমিনে তদন্ত করতে, তারচেয়ে বেশি অতীত ফিরে যেতে। সে প্রয়োজনও অনেকটা ফুরিয়ে গেছে। কেন যেন কোনো কিছুই তাকে টানছে না। বরঞ্চ নিজের মনে ঢাকা ফিরে যাওয়ার এক তাড়া অনুভব করছেন তিনি। বাবা-মায়ের গড়ে দেয়া স্বপ্নে নয়, মানুষ নিজের স্বপ্নের পথে হাঁটতে পছন্দ করে বলেই কি এ তাড়া? নাকি দুঃসহ স্মৃতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাকুলতা? জানা নেই তার।

'আমরা আজই কেন ফিরছি না আপু?', ফেরার পাথে আইদা জিজ্ঞেস করল।

–দুজন মানুষকে খুঁজতে হবে। তার মধ্যে একজন মজনু মিয়া। সম্ভবত তাকে আর আমি পাব না। আর... আরেকজন আমার বাবা।

গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠল তাওফীকার।

–আপনার বাবার কী হয়েছে?

–জানা নেই। অনেক বছর যাবৎ তার কোনো খোঁজ না পাওয়ায় একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি পেয়েছি এ সম্পত্তি।

আইদার মনে শত প্রশ্ন জমা হলো, কিন্তু সে কিছু জানতে চাইল না। আবার যদি ম্যামের অজানা কোনো ক্ষতে আঘাত লাগে!

ফিরতে ফিরতে তাওফীকা নায়লাকে ফোন দিলেন। এই দু-দিনে ঘটে যাওয়া সবকিছু বিস্তারিত বললেন। বললেন না মনের ভেতর ঘটে যাওয়া জলোচ্ছ্বাসের কথা। বললেন অল্পই, না বলা রইল অনেককিছুই। এভাবেই মানুষের বলে যাওয়া কথার ভাঁজে না বলা কত কথা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বাতাসের সাথে মিশে যায়। বাতাসকে যদি বলার ক্ষমতা দেয়া হতো, তাহলে দীর্ঘশ্বাসেরা মনেই প্রতিধ্বনিত হয়ে সমাধিস্থ হতো, হাজারো কথা মনের অন্দর পেরুনোর অক্ষমতায় সেখানেই ছটফট করে লুটিয়ে পড়ত। এ জন্যই বুঝি বাতাসকে কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়নি!

কথা শেষে নায়লার বিস্মিত প্রশ্ন ধেয়ে এল,

–ওই লোকগুলো কোথায়?

একই প্রশ্ন তো তাওফীকা আর আইদারও। নায়লার সঙ্গে আরও টুকটাক কথা বলে এই গ্রামের ওসির নম্বরটা কোনোভাবে জোগাড় করা যায় কি না দেখতে বললেন তিনি। নায়লা ফোন রেখে দিল।

হঠাৎ কী মনে পড়তে রাস্তা পাল্টে বাজারের দিকে চললেন। সেখানে একজনের কাছ থেকে চেয়ারম্যান-বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে রিকশায় চড়লেন।

নিচু টিনের বেড়ার এপাশ থেকে দোতলা বাড়িটা পুরোই দেখা যাচ্ছে। বেড়াটা টিনের হলেও রংচং মিলিয়ে বেশ লাগছে। একটা কাঠের দরজা খোলাই আছে। দুজনে আলগোছে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সামনে উঠোন। জায়গাটা একেবারে অল্প নয়, আবার 'বিশাল' বলে চোখ কপালে তোলার মতোও নয়। মোটামুটি বিত্তশালী হলে যতটুকু হতে পারে, ঠিক ততটাই। আশেপাশে নজর বুলিয়ে বুঝলেন, ভদ্রলোক বেশ সৌখিনও। দুটি স্যান্ডোগেঞ্জি

পরা ছেলে গুলতি খেলছে। হাতের ইশারায় তাদের ডাকল আইদা। দৌড়ে এল দুজনেই,

–এটা কি আলতাফ সাহেবের বাসা'?

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ওরা।

–তিনি কোথায়'?

ছেলে দুজন তারস্বরে 'আব্বাআআআ' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই চমকে উঠলেন তাওফীকা। এইটুকুন ছেলে দুটোর গলায় এত জোর! বাপরে!

লুঙ্গি আর শার্ট পরা এক ভদ্রগোছের লোক বেরিয়ে, 'হইছে কী' বলে ঝাঁঝিয়ে উঠতেই চোখ পড়ল দাঁড়ানো দুই মানবীর দিকে। খানিকটা লজ্জা পেয়ে গেলেন যেন।

তাওফীকা অনেকটা নিশ্চিত, তাদের বদলে দুজন পুরুষকে তিনি এই ভরদুপুরে আসতে দেখলে বিরক্তিতে চোখ কুঁচকাতেন। পুরুষ কিংবা নারী দুই জাতিই তাদের বিপরীত জাতির প্রতি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে সহজে। আর এ অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে তথাকথিত নারীবাদীরা নারীদের পণ্যে পরিণত করে ছেড়েছে। আর কাঙ্গাল নারী জাতি মধুর কথাকে ভালোবাসা ভেবে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছে। মনের গভীরে আবারও অনুভব করলেন পর্দারক্ষার তাড়া।

–আপনেরা...?

–আমি তাওফীকা, ইনি আইদা। আমরা 'আঁচল' থেকে এসেছি। আপনার সাথে কথা হয়েছিল...।'

–ওহ্, আপনারা! হ্যাঁ, মনে আছে আমার। আসুন না, বসুন।

ভদ্রলোক বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

চা খেতে খেতে আলাপ হলো নানা বিষয়ে। গ্রামে ভালো কোনো স্কুল নেই। মোটামুটি ভালো স্কুলগুলো কিছুটা দূরে। তাওফীকা যেটাতে পড়তেন, সেটাও অনেকটা দূরে ছিল। তবে এখন সেটার কোনো অস্তিত্ব নেই। রাজনৈতিক পালাবদলে বদলে গেছে সে স্কুলের ভাগ্যও। তিনি মধুমঞ্জুরীর পাশের খোলা জমিটাতে একটা স্কুল দিতে চাইছেন...। মনে ইচ্ছা, ধীরে ধীরে আঁচলের একটা শাখা খুলে তিনি নিজেও এখানে থিতু হবেন। একা মানুষেরা তো অতীত নিয়েই বাঁচে! চেয়ারম্যান সাহেব এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলে আন্তরিক কথা দিলেন।

এ দু-দিনে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো শুনে তিনি বললেন,

–তারা আর আপনাদের বিরক্ত করবে না আশা করি। আজই খুব সকালে গোয়েন্দাপুলিশের একটি ছোট্ট টিম তাদের সব ক'জনকে ধরে নিয়ে গেছে।

–গইস? সেও কি...?

–নাহ্! ও যে কোথায় আছে! তবে এই টিম বেশ তৎপর। ধরে ফেলবে আশা করি। এর মাঝে হয়তো ধরেও ফেলেছে।

কোথায় যেন একটু খারাপ লাগা কাজ করছিল তাওফীকার। হোক না দু-দিন! তবুও তো ওর ভালো থাকার উপলক্ষ্য ছিল এই খুনে ডাকাত! আসলেই কি ধরা পড়ল? কী শাস্তি হবে ওর? জানার তাড়া অনুভব করলেন মনের লুকোনো কুঠুরি থেকে।

তাওফীকা জানতে চাইলেন তার বাবার কোনো খোঁজ তিনি পেলেন কি না। চেয়ারম্যান হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকালেন,

–নাহ্! এইটুকু জানা গেছে, তাকে কোনো কারণে পুলিশ খুঁজছিল। তিনি গা ঢাকা দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন। এরপর তাকে আর এ গাঁয়ে দেখা যায়নি। ঢাকাতে কোথাও আত্মগোপন করে আছেন বলেও মনে হয় না। কারণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার খুঁজতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে প্রশাসন। আপনাকে খুঁজে পেতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে। সম্পত্তির জন্য হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যেত। আমার মনে হয়, পলাতক অবস্থাতেই কোথাও তিনি মারা গেছেন।

চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরনিও বেশ চমৎকার মহিলা। তার সাথে আলাপ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। না খাইয়ে ছাড়লেন না তিনি। দুজনেই তাদের আতিথ্য বেশ উপভোগ করলেন। এমন পারিবারিক উষ্ণতা পান না তাওফীকা বহুকাল। ইচ্ছে করেই একটু ঢিমেতালে খাওয়া শেষ করলেন। অলসমাখা রোদ্দুরে প্রিয়জনের পাশে বসে দুটো কথা বলার সুখ দেখার মধ্যেও এক আনন্দ আছে। ঈর্ষা-মিশ্রিত আনন্দ। এক চিনচিনে কষ্ট আছে। প্রার্থনামিশ্রিত কষ্ট।

ফেরার পথে চেয়ারম্যান সাহেব দুজন লোক আর একজন মহিলা দিয়ে দিলেন সাথে। তাওফীকাই চেয়েছিলেন। বাড়িটা একটু পরিষ্কার করে যাওয়ার ইচ্ছে।

আইদা বলল,

–দুজনে অনেক দেরি হবে আপু। আসেন, আমরাও লেগে যাই।

তাওফীকা কিছু পড়াশোনা নিয়ে বসতে চেয়েছিলেন। আইদার কথা শুনে ভাবলেন, একসাথে কাজে লেগে গেলে মন্দ হয় না। পাঁচ জনে মিলে লেগে গেলেন এ পুরোনো বাড়িটাকে তকতকে করার কাজে। শুধু কিছু কিছু জায়গা মার্ক করে দিলেন তাওফীকা, এ জায়গাগুলো কেবল তিনিই পরিষ্কার করবেন। ইচ্ছে, কিছু স্মৃতি সযত্নে তুলে রাখবেন।

মোটামুটি সবকিছু পরিষ্কার করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল প্রায়। মাঝে আসরের নামায পড়ে একদফা চা খেয়েছেন সবাই। এখন একটা জায়গা বাকি। সেই বন্ধ দরজাটা। বাবার রুমটা।

লোক দুজন মিলে ধাক্কা দিল, কিন্তু দরজাটা খুলল না। হঠাৎই পাশ থেকে আইদা বলল,

–দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নাকি!

তাই তো! এ সম্ভাবনার কথা তো মাথায়ও আসেনি কারও। কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ মানে কেউ আছে ভেতরে! এও বা কী করে সম্ভব?

অপেক্ষা করতে বলে একজন লোক বেরিয়ে গেল। অল্প সময়েই একটা শাবল, কোদাল নিয়ে ফিরে এল। ধমাধম কয়েক ঘা লাগাতেই চিড়বিড় করে উঠল পুরোনো দরোজা। একটু পরই ধড়াম করে বিকট আওয়াজে হার মানল সে।

ভেতরে আলো ফেললেন তাওফীকা। মাকড়সার ঝুল আর দরজার পতনে উড়তে থাকা ধুলাবালির রাজত্বে প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না। বালির প্রচণ্ডতা ক্রমে কমে এলে এক এক করে চোখে পড়ল নকশা করা বিশাল পালঙ্ক, দেয়ালে ক্ষয়ে গিয়ে আধঝোলা হয়ে থাকা পেইন্টিং, আয়না ইত্যাদি ছোটখাটো আসবাব। সবকিছু মিলে ঘরটায় এখনো যেন আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে। তাওফীকা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তার হঠাৎই কান্না পাচ্ছে। ভীষণ কান্না। বাবার আদর না পাওয়া মানুষটির মনেও 'বাবা' শব্দটি আজীবনই ভালোবাসায় সিক্ত থাকে, বাবা নামের মানুষগুলো কখনো সখনো দূষিত হয়ে যায়, কিন্তু শব্দের আবেদন কখনো ফুরায় না। 'বাবা' বলে কেঁদে ওঠার মাঝেই যেন শব্দের সার্থকতা!

আইদার আঁতকে ওঠার আওয়াজে আর ভীত চিৎকারে নিজেকে সামলে নিলেন

তাওফীকা। 'কী হয়েছে' বলে এগিয়ে যেতেই তিনিও দেখতে পেলেন ভয় ধরানো সে দৃশ্যটি। ভাঙা দরোজা দিয়ে আসা গোধূলির শেষ আলোটুকু টর্চের আলোর সাথে মিশে গিয়ে অদ্ভুত এক অত্যুজ্জ্বল আলো তৈরি করেছে। মৃদুভাবে উড়তে থাকা ধুলাবালি আর মাকড়সার জালে পুরোনো আসবাব জন্ম দিয়েছে এক অপার্থিব পরিবেশ। যেন একলাফে তারা পৌঁছে গেছেন কয়েক শতাব্দী আগে। গা ছমছম করা এ পরিবেশের ষোলকলা পূর্ণ করতেই যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে এক কঙ্কাল, ঘুণে ধরা কঙ্কাল। শূন্য অক্ষিকোটর আর আবরণহীন দন্তপাটি যেন পরিহাস করছে। ক্ষণিকের জন্য তিনিও চুপসে উঠলেন। অজান্তেই আঁতকে উঠলেন।

কার এ কঙ্কাল? একটু ধাতস্থ হতেই সবার মনে একই প্রশ্ন জেগে উঠল। তবে এ কঙ্কাল বুঝিয়ে দিল আইদার ধারণাই ঠিক। সে ছিল ভেতরে আর দরজা ছিল লাগানো। ভালোমতো তাকাতেই চোখে পড়ল, কঙ্কালের পাশে পড়ে রয়েছে এক রশি। রশি না বলে রশির কঙ্কাল বলাই ভালো। পোকায় খেয়ে কেবল এর অস্তিত্বটুকু রেখেছে, ভেতরটা সারশূন্য। দেখে বোঝা যাচ্ছে, হাত দেয়ামাত্র ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে পুরো রশিটা। তাওফীকা কোনোকিছুতে হাত দিতে নিষেধ করে দিলেন।

একটু একটু করে কঙ্কালটার দিকে এগোলেন, কিছুতে হাত না লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তার পরিচিত কেউ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে বাড়িটা যেহেতু পড়ে ছিল দীর্ঘদিন, অন্য যে কেউ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না।

কাছ ঘেঁষতেই চিকচিক করে উঠল একটা বস্তু। একটা স্বর্ণের চেইন, এখনো কঙ্কালের গলায় ঝুলছে। এত বছরেও চাকচিক্য একবিন্দু নষ্ট হয়নি। কী মনে হতে ওপরে তাকালেন। ঠিক বরাবর ফ্যানটা। তাওফীকা নিজেকে যেন আর রুখতে পারছিলেন না। বড়ত্বের চাদরে মোড়া বাবাও শেষ পর্যন্ত পরাজিতদের তালিকায় ভিড় বাড়ালেন! তবে আর কী লাভ দুনিয়ার এ ক্ষণিকের বড়াইয়ে? মৃত্যু যেখানে অলঙ্ঘনীয় সত্য আর মৃত্যুর পরের জীবন অবধারিত?!

তবুও নিজেকে সামলাতে পারলেন তিনি। হয়তো সে মানুষটির প্রতি এক চাপা ক্ষোভের কারণে, যে মানুষটির জন্য তাকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে দিশাহীন জীবনের পথে পথে; হারাতে হয়েছে আত্মপরিচয়টুকুও! চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'এই রুমটা থাক। পুলিশ এসে যা দেখবার দেখবে।'

লোকদের তাদের পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিলেন তিনি। চেয়ারম্যানকে ফোন দিলেন। আগামীকাল বাবার জানাযা পড়াতে চান। চেয়ারম্যান সব ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেন। তাওফীকা সেদিন সে রুমটাতেই রইলেন। শেষ জীবনে কী এমন হয়েছিল, যার জন্য জাহাঙ্গীর আলমকে আত্মহত্যা করতে হল? দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। বস্তুত পাপ কখনো জয়ের পথ দেখায় না, এভাবে না ওভাবে, সে পরাজয়কেই অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। হয়তো এপারে, নয়তো ওপারে।

রাত বাড়ছে। আইদা খানিকটা ভয় ভয় মনে ঘুমোতে গেল। ম্যাম রাতে কিছুই খাননি। মুখ দেখে জোর করারও সাহস হয়নি। গম্ভীর মানুষটা আরও বেশি গম্ভীর হয়ে গেছেন। চেহারায় শত ভাঁজ, যেন একদিনেই তিনি বুড়িয়ে গেছেন। প্রাণোচ্ছল জীবনীশক্তির সবটুকু যেন একসাথে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আইদার মুখেও খাবার রুচে না। চা খেয়ে শুয়ে পড়ে। এক জীবন্ত ভাঙা-গড়ার গল্প দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

আইদা ঘুমিয়ে যেতেই তাওফীকা উঠে পড়েন। চুপচাপ পায়চারি করেন কিছুক্ষণ, ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসেন। ওই অনেকটা দূর, কিন্তু একান্ত আপনার চাঁদের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। ছোটবেলায় কার কাছে যেন শুনেছিলেন, মানুষ নাকি আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে পারে না। কিন্তু কই! ছোট থেকে তার কান্নার নিত্যসঙ্গী ওই আকাশ আর আকাশের ঘরে বাস করা চাঁদ!

রাত গভীর হয়, তাওফীকা আরও বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠেন। মায়ের ঘরটার দিকে এগোতে চান, গা ছমছম করে ওঠে। পিছিয়ে আসেন। দরজা খুলে বের হতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ওই আঁধার ইচ্ছেটাকে গিলে খায়। জীবনে কিছু কিছু সময় একাকী সয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শুধু কাঁধে হাত রাখার জন্য হলেও একজন সঙ্গী লাগে। তাওফীকা মোবাইলটা হাতে তুলে নেন। আবেগের বশে কি ভুল করতে চলেছেন নাকি বাস্তবতার দায়বদ্ধতার কাছে হেরে যাচ্ছেন? উত্তর খুঁজতে চাইলেন না আজ। ডায়াল করলেন। যেন বহুকাল পর আওয়াজ ভেসে এল,

–আসসালামু আলাইকুম, তিতিন!

ফজরের আযানের সাথে সাথে ধ্যানভঙ্গ হলো তাওফীকার। আজকের সুবহে সাদিক তার জীবনে নিয়ে আসবে নতুন বারতা। হয়তো আজ হবে একাকিত্বের ছুটি কিংবা নিজে হবেন একাকিত্বের কারাগারে চিরবন্দী। গতকাল সাইফুলের সাথে দুই মিনিট কথা হয়েছে। গ্রামের ঠিকানা দিয়ে বলেছেন আগামীকাল যেন বাবার জানাযায়

আসে। আজ তিনি ওকে সব বলবেন। জীবনের যতগুলো পথ মাড়িয়ে এসেছেন, সব পথে সাইফুলকেও ঘুরিয়ে আনবেন। বলবেন তার চাওয়াগুলোও। এরপরের সিদ্ধান্ত তার।

বাদ যোহর। পুলিশের ঝামেলা শেষ করে বাবার লাশ দাফন করে গাঁয়ের লোকেরা মাত্র ফেরার পথ ধরেছে। কবরস্থানের অদূরেই আইদার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে তাওফীকা। চেয়ারম্যান সাহেবও সৌজন্য-সমবেদনা জানিয়ে চলে গেলেন।

-আইদা, তুমিও বাসায় যাও। পারলে ব্যাগ-ট্যাগ যা পার গুছিয়ে ফেলো। আমি কিছু পরই ফিরছি।

আইদা কিছু বলল না। সব শোকে সান্ত্বনা দিতে নেই। কিছু শোক সান্ত্বনাবিহীনই সুন্দর। ম্যামকে তার সুযোগ করে দিল ও।

কবরস্থানে তাওফীকা একা। এক একটি কবর এক একটি সতর্কসংকেত। এখানে বা ওখানে, কবরের ভয়ংকর নির্জনতার সম্মুখীন হতে হবে সবাইকে। দুনিয়ায় এত এত লোকের মাঝেও লুকিয়ে থাকা নির্জনতাগুলোই কী ভয়ংকর, অকল্পনীয় সে নির্জনতা আর কতটা অসহনীয় হবে?! দু-ফেরেশতার গম্ভীর প্রশ্নের জবাবে কে স্থির রইবে? রবের সামনে দাঁড়িয়ে জীবন-খাতা খোলার দুঃসাহস কার হবে!

তাওফীকা সংকুচিত হয়ে ওঠেন। অসহায় মানুষগুলোর জন্য করা কাজগুলো কি প্রভু গ্রহণ করবেন নাকি করা ভুলগুলোর জন্য কঠিন হবেন? বাহ্যিকভাবে পর্দা ছাড়া বাকি সব বিধান মানলেও নিজের মননে লুকোনো কত শত গুনাহের ওজন যে বড় ভারী! সাইফুল কি তাকে পর্দার সুযোগ করে দেবে? জীবনের বাকি সময়টায় করা গুনাহের অনুশোচনায় কাটিয়ে ফেলতে দেবে? নাকি.. .. নাকি..।

তাওফীকার চোখ আটকে যায় অনতিদূরের এক কবরফলকের দিকে। চঞ্চলপায়ে এগিয়ে যান। কবরস্থিত মানুষটির নাম 'নীলা'। মৃত্যু আরও বছর ছয়েক আগে। ম্যামকে খুঁজতে হলো না, তিনি নিজেই এসে সামনে দাঁড়ালেন তাওফীকার। পা ভাঁজ হয়ে আসে তার। এক মুঠো মাটি তুলে নেন। গালে মাখেন—'ম্যাম! আমি ফিরেছি! আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার কথা মেনে নিয়ে আমি ফিরেছি! বলে ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি। তপ্ত আঁখিনীরে ভিজে যায় কপোল, ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে আচমকাই উদিত হয় একজন মানুষের অবয়ব। সে অবয়ব ধীরপায়ে এগিয়ে আসতে থাকে তার দিকে।

লেখিকা পরিচিতি

ফারহীন জান্নাত মুনাদী। জন্ম ১৯৯৪ সালে। পিতা—প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী। ফারহীন কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাক-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ২০১১ সালে ফযীলত এবং ২০১২ সালে তাকমীলে উত্তীর্ণ হন। এ দু পরীক্ষায় তিনি যথাক্রমে মেধাতালিকায় ৩য় স্থান ও ১ম স্থান অধিকার করেন। এরপর ২০১৩ সালে ইফতা শেষ করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। প্রায় ছয় বছর তিনি বুখারি, তিরমিযি-সহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাব ও তাফসীরে জালালাইনের শিক্ষকতা করেন। লেখিকা শিক্ষকতার পাশাপাশি অব্যাহত রেখেছেন জ্ঞানসাধনা ও কলমচর্চা। জীবনসঙ্গী হাফিজ আল মুনাদীর সাথে তার যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ 'নবিজির পরশে সালাফের দরসে' পাঠকের মনে স্থান করে নিতে সক্ষম হয় আলহামদু লিল্লাহ। বর্তমানে তিনি এক সন্তানের জননী।

জীবনের ধাপগুলো সবার জন্য যেমন জটিল হয় না তেমনি অনেকের জন্য সহজও হয় না খুব। অবহেলা, অন্যায়-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কারও কারও জীবন। কেউ-বা আবার স্বস্তি খুঁজে ফেরে ভুল পথে, আশা ছেড়ে হতাশার অতল গহ্বরে। সে পথে আদৌ কি স্বস্তি মেলে? জানতে হলে সঙ্গী হতে হবে তিতিনের।

পথে পথে ও পরাশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ছোট্ট তিতিন! বড়োলোক বাবার আলিশান মহল ছেড়ে আসা যে মেয়েটির সঙ্গী ছিল—ক্ষুধা, অভাব, নিঃসঙ্গতা, নিষ্ঠুরতা। রূঢ় বাস্তবতায় নিষ্পেষিত ছোট্ট তিতিনের কাছে ধাপে ধাপে ধরা দেয় মুখোশে আচ্ছাদিত অধুনা সমাজের আসল রূপ—বীভৎস চেহারা। তার চোখে প্রকট হয়ে ওঠে বিলাসিতায়-মোড়া জীবনের অস্বচ্ছতা। সে বুঝতে পারে, এ সভ্যসমাজ তাদের ভেতরের পাশবিকতাকে পোশাকে মুড়িয়ে রাখতে কতটা তৎপর! অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ তিতিনের কাছে তখন যেন বিভীষিকার নাম। তার মনে হতে থাকে—সে একা, বড়ো একা! শত মানুষের ভিড়ে তার আপন মনে হতে থাকে এক পথ; সে পথ তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে – আত্মহত্যা! তারপর?

সে এক ইতিহাস! অতীত খুঁড়তে আসা তাওফীকা নামের মধ্যবয়সী নারীর পেছনে ফিরে দেখার ইতিহাস! এ এক জীবনের গল্প! তিতিন-তাওফীকার গল্প! যে গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সমাজের উঁচু-নিচুর বিভেদ, দ্বীনহীন সমাজে বেড়ে ওঠা অসহায় মেয়ের আত্মপরিচয়-সংকট; ফুটে উঠেছে 'সুশীল সমাজের' চিত্র। আসুন সঙ্গী হই তার। তার সাথে খুলে পড়ি এক ইতিহাসের খেরোখাতা।